মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১৬ – ৩০ এপ্রিল ১৯৮৮

ভ্রমণ : রূপসী বাংরিপোষী

ফ্যাশন : পছন্দের শাড়িতে নন্দিনী



ভালবাসাবাসি

ডাক্তারের সংগে কিভাবে কথা বলবেন

নববর্ষ : এপারে, ওপারে

কিভাবে কেনাকাটা করবেন



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ অরূপ রাউত

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

সুকন্যা

বর্ষ ৪ সংখ্যা ১০/১৬ – ৩০ এপ্রিল ১৯৮৮/৩ বৈশাখ – ১৭ বৈশাখ ১৩৯৫

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অতীশ ঠাকুর
ফটো : সৌগত রায়বর্মন

প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

মতামত

অথ দাম্পত্য প্রসংগ

যুগ যুগান্তর থেকে আমাদের দেশের নারী অবহেলিত। বিয়ের পরেও নতুন বধূ হিসেবে স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তবে অনেক ক্ষেত্রে বধূ পুড়িয়ে মারার প্রধান কারণ হল যৌতুক নিয়ে অসন্তোষ। পণপ্রথা যে কীভাবে আমাদের দেশের যুবতী মেয়েদের সর্বনাশ করছে তা অবর্ণনীয়। তবে এটা নিঃসন্দেহ বধূকে পুড়িয়া মারা খুবই নির্মম, পৈশাচিক বর্বরতা। মার্চ ১ – ১৫ সুকন্যায় আপনার প্রতিবেদনটি খুবই সুন্দর ও সময়োচিত। দেশের যুবকদের এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করে কীভাবে গৃহবধূ পোড়ানোর অবসান হতে পারে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই নির্মম ও বর্বরতার শীঘ্রই অবসান হওয়া উচিত। যেসব লোকেরা বধূকে পোড়ান তাদের সারা জীবন কারাদন্ড দেওয়া উচিত।

এছাড়াও দাম্পত্য সুখের হয় (সুকন্যা ১৬ মার্চ) খুবই সুন্দরভাবে লিখিত। দাম্পত্য সুখের প্রসংগে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মীণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ ব্যানার্জি ও আরতি ব্যানার্জি এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলা মুখোপাধ্যায়ের দাম্পত্য সুখের আসল পরিচয় ও কিছু তত্ত্বও জানা গেল। তবে দাম্পত্য সুখের প্রধান সহায়ক হল স্বামী ও স্ত্রীর বোঝাপড়া, মানসিক চিন্তা, অ্যাডজাস্টমেন্ট ও সন্দেহ থেকে দূরে থাকা। প্রতিটি পদক্ষেপে ও বিশেষ কোনো গভীর সমস্যায় জড়িত হলে উভয়ের পরামর্শ ও বুদ্ধিবিচার একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন উড়ো খবরে কোনদিন বিচলিত হওয়া একেবারেই উচিত নয়।

ভূপেন বসু ও কল্যাণী বসু
টেলকো, জামসেদপুর – ৪



মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা চাই

আমি দীর্ঘদিন যাবত সুকন্যার পাঠিকা। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, সুকন্যাতে মেয়েদের মতামতের তেমন কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। সুকন্যার ওপরে লেখা থাকে মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা, কিন্তু আমরা সেটা ভাবতে পারছি কী? আজকাল খুব কম মহিলার নাম মতামত বিভাগে দেখতে পাই। সুকন্যা বাংলা ভাষায় প্রথম মহিলা পত্রিকা এবং আমরা সুকন্যাকে ১ নং হিসেবেই পেতে চাই। ম্যাগাজিন কিনে যদি মন না ভরে তাহলে আপশোস হয়। আপনাদের নিকট আমাদের অনেক প্রত্যাশা। পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুটা আমরা আশা করতে পারি নিশ্চয়ই।

রেবা সেনগুপ্তা
হোজাই



চিন্তাধারার পরিবর্তন প্রয়োজন

আমরা নারীমুক্তির আন্দোলন করছি। নারী জাগরণের জন্য তোড়জোড়, নারী স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব, এসব সফল হবে তখনই যখন পুরুষরা এর প্রকৃত মূল্য দেবে। নারীজাতির যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার আসল কলকাঠি তো পুরুষশাসিত সমাজেরই হাতে। প্রকৃতপক্ষে অনেক পুরুষই চান না স্ত্রীদের স্বাধীনতা। বধূ নির্যাতনের ঘটনা ইদানীংকালে পত্রপত্রিকাগুলি প্রকাশ করছে বলে সকলেই আহা, উহু করছেন। বহুকাল ধরেই তো এসব ঘটনা ঘটে আসছে তেমন করে প্রতিবাদমুখর হয়নি কোথাও। অনেকেই আছেন পরের বাড়ির ঘটনায় ধিক্কার জানাচ্ছেন কিন্তু পরিবারের ঘটনার ক্ষেত্রে পুরুষের একাধিপত্য বজায় রেখে সংসারের অন্যান্য মহিলাদের উস্কে দিয়ে নবাগত কোনো বধূর প্রতি শাসন অব্যাহত রাখতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। এক্ষেত্রে নারীরা যে মানুষ এ সম্পর্কে কোনো চৈতনা নেই, নারীদের যদি সে চেতনা জাগে, তখনই 'গেল গেল' রব। শাসনে শোষণে বন্ধ করতেই বন্ধপরিকর হতে হয় পুরুষদের। একটি কন্যা যখন পিতা-মাতার 'স্নেহ-সংগ ত্যাগ করে অন্য এক নতুন পরিবারের জায়া রূপে সংগী হয় তখন তার মানিয়ে নেওয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতির যথেষ্ট প্রয়োজন। তার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভংগী হওয়া উচিত সকলের। অনেক ক্ষেত্রে নতুনকে স্বাগত জানানো তার অধিকার ইত্যাদি তার হাতে সঁপে দেওয়া এবং নতুনেরও অভ্যর্থনা সম্পর্কে সচেতনতা ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীনতার সামান্য কারণে আত্মসম্মানে আঘাত থেকেই ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত এবং মনোমালিন্য ও মানসিক কষ্টের জন্ম নেয়। তারপর পণের ব্যাপারে যদি কোনো অশান্তি থাকে তাহলে তো মানসিক দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়।

বধূনির্যাতনের ঘটনা সব ক্ষেত্রেই যে পণের জন্যে হচ্ছে তা নয় অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলি হল – আপাত দৃষ্টিতে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা, গুরুজনদের অবমাননা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহার, বধূর প্রতি অনদের দুর্ব্যবহার, স্বামীর কোনো উপসর্গ, শারীরিক চাহিদাপূরণে ঘাটতি ইত্যাদি ইত্যাদিতে দুজনের টানের ঘাটতি মনোমালিন্য অবশেষে লাঞ্ছনা নির্যাতন – হত্যা বা আত্মহনন। এসব ক্ষেত্রে প্রথমত : যে পরিবারে বধূটি গিয়েছে সেই পরিবার যদি সহানুভূতি সম্পন্ন হন তাহলে মানিয়ে নিতে বা দোষ-ত্রুটি শোধরাতে বধূটিকে সুযোগ দেবেন ও সাহায্য করবেন। বধূহত্যা বা আত্মহনন বন্ধ করতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন – যা বোঝাবুঝি ও চিন্তাভাবনা দিয়ে সহজেই সমাধান করা যায়। এটুকু তো ভাবা যায় আমি নিজের মেয়ের অধিকার সম্মান নিয়ে যা দাবি করি অন্য পরিবারের মেয়েটির তো সে দাবি আছে। বিশেষত ইদানীংকালে নারীজাতির অধিকার তো সর্বাত্মক – তাকে আর কত অস্বীকার করা যাবে?

ঈশানচন্দ্র মিশ্র ও মমতা মিশ্র
সিংভূম, বিহার



অবাধ্য সন্তান

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'অবাধ্য সন্তান' রচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসংগিক। এই ধরনের লেখা প্রকাশ করলে মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ও দায়িত্ব বিষয়ে সজাগ করা সম্ভব। যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা সবগুলিই ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সন্তান কেন অবাধ্য এই সমস্যার মূলে না গিয়ে আমরা কতগুলি মনকাড়া ধারণায় অবাধ্য সন্তানকে দোষী করি। কিন্তু আপনাদের লেখাটিতে রত্না মিত্র খুবই সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন। এই ধরনের আরও লেখা প্রকাশ করুন। বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক ডাক্তার গাংগুলির বক্তব্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সুছন্দা চট্টোপাধ্যায়
টিটাগড়

সম্পাদকীয়

এ পিপাসা সুমধুর

এ এক অস্থির সময়, যখন মানবিক আবেগ, অনুভূতি ও মূল্যবোধের – নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে চলেছে। মানুষ এখন প্রযুক্তি বিজ্ঞানের স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা। কিন্তু 'হৃদয়' নামক সনাতন বস্তুটিকে এখনও ততটা যুক্তিবদ্ধ করতে পারেনি, তাই 'মানুষের তরে কোনো এক মানুষীর গভীর হৃদয়ের' আকৃতি থেকেই যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে নলজাতশিশু নরনারীর রহস্যময় জৈবজীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান বিজ্ঞান করতে পেরেছে। কিন্তু হৃদয় রহস্যের কোনো উন্মোচনই তেমন ভাবে হয়নি। তাই আজও ভালবাসাবাসির, মন দেওয়ানেওয়ার হাজারো মরণে মরতে হয় নরনারীকে। অকারণ অসম প্রেম মানুষকে করে ঘরছাড়া। আর্য থেকে লোকায়ত সব সমাজে নরনারীর জীবন-রহস্যে এই প্রণয়, প্রেম, পীরিতি কিংবা ভালবাসাবাসির বিচিত্র রূপ। অবশ্য প্রণয় ও প্রেম শব্দদুটির মধ্যে আছে এক ধ্রুপদী গাম্ভীর্য। কিন্তু ভালবাসাবাসির মধ্যে আছে আটপৌরে অন্তরংগতা। যেন প্রসাধনহীন হৃদয় সংলগ্নতা। একজোড়া নারী-পুরুষের হৃদয়ের ঝুলনযাত্রার মধ্যে দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবি।

পৃথিবীতে কবিরাই একমাত্র মেধাবান পুরুষ যাঁরা প্রেমকে তার স্বরূপে শনাক্ত করতে পেরেছেন। জীববিজ্ঞানী থাইরয়েড গ্রন্ডের রসক্ষরণে আবিষ্কার করেছেন অন্ধ প্রবৃত্তির জৈব আকর্ষণ। কিন্তু প্রেম বা ভালবাসাবাসির কতটা জৈব আর কতটা মানসিক তা নিশ্চয় করে বলাই হল শেষ কথা বলা। বলতে চাই না, কারণ আমরা পৃথিবীকে ভালবাসি, ভালবাসি ভালবাসাকে। প্রেমের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বোধ হয় চরম কথা বলছেন, 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। যে হৃদয়নুভূতির কোনো পরিমাপক যন্ত্র নেই, কিন্তু যা জীব জগতে অমোঘ নিয়তির মত অঘটনঘটনপটীয়সী।

প্রেমকে কবি হৃদয়ের বিশল্যকরণী হিসাবেই চিনতে পারে। তাই কবি কণ্ঠে :

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে –
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপন-সখী চির অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন – এ বিশ্বের সেই ঠাকুরানী!
নেত্র তার মৃত্যু নীল! – অধরের হাসি বিথারে
বিস্মরণীয় রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম রাজধানী।
উরসে অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস। জানি তাহা জানি।

(মোহিতলাল মজুমদার)

পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যা ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে হৃদয়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হল প্রেম। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় হল সেই চিরন্তন প্রেম বা ভালবাসাবাসি।



ভালবাসাবাসি

প্রেমহীন, ভালবাসাহীন যৌনাচার অশ্লীলতারই শামিল। শারীরিক চাহিদা ও আবেগের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটলেই শুধু একজোড়া মানুষ-মানুষী একাকার হয়ে যেতে পারে। যৌনজীবনের এই গভীর দিকটি নিয়েই পৃথা সেনের এই বিশ্লেষণমূলক রচনা।

'লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ/ তবু হিয়া জুড়ন না গেল'। – এ শুধু বিদ্যাপতির প্রেমগাথা নয়, চিরন্তন সত্য। শুধু দোঁহে দেহে মিললেই চরম তৃপ্তি মেলে না, যার রেশ শেষ হয়েও শেষ হয় না। সেই শেষহীন রেশ পেতে হলে মন দিয়ে দেহ ছুঁতে হয়, দেহ দিয়ে মন নয়। করতে হয় হৃদয়ে হৃদয় যোগ। এ সত্য মেনে নিয়েছেন আধুনিক যৌন বিশেষজ্ঞরাও। জনৈক প্রখ্যাত সেক্সো-থেরাপিস্ট নরনারীর যৌনজীবন নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা যেন সেই বিদ্যাপতিরই প্রতিধ্বনি। তিনি বলেছেন, আমরা যখন আমাদের দৈহিক প্রয়োজনগুলিকে আমাদের আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে পারি, তখনই আমরা আমাদের ইপ্সিত যৌন সুখের আবেশে লীন হয়ে যেতে পারি। সে সুখ এমনই, যা লাখো লাখো যুগ ভোগ করেও তৃষ্ণা মেটে না। বক্ষ জুড়ে তৃষ্ণা থেকেই যায়।

যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত জৈবিক প্রয়োজন। তবে এই শারীরিক ক্ষুন্নিবৃত্তি শুধু বিপরীত লিঙ্গের একটি দেহই মেটাতে পারে বলে যৌন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না। তাঁদের মতে, তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নিবিড় ভালবাসার মোড়কে ঢেকে কোন বিপরীত লিঙ্গের দেহের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেলে, যে সুখ মেলে, তা স্বর্গীয়। কিন্তু কোন স্বামী হয়তো বিছানায় এসেই প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্ত্রীর ওপর। স্ত্রী বেচারা ব্যাপারটা ভালভাবে আঁচ করার আগেই স্বামীর বিক্রম শেষ। বিদ্রোহী রণক্লান্ত শ্রান্ত স্বামী গর্জন তখন শুধু নাসিকায়। এ ধরনের যৌনাচারে শারীরিক ক্ষুধা হয়তো সাময়িকভাবে মেটে, কিন্তু তা শরীর ও মনে আনন্দের রেশ ছড়ায় না। সুতরাং জৈবিক সুখের চাবিকাঠি আসলে ভালবাসা।

ভালবাসার চাবি দিয়েই দেহের দরজা খুলতে হয়। তবেই স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন দেহে একাকার হয়ে যেতে পারেন।

সম্প্রতি এই প্রতিবেদকের সঙ্গে জনৈক প্রখ্যাত সেক্স-থেরাপিস্টের কথা হয়েছে। যৌনসমস্যা নিয়ে যেসব রোগী তার কাছে আসেন তাঁদের তিনি যেসব উপদেশ দিয়ে থাকেন তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে।

শুধু যৌনাচারের জনাই ভালবাসবেন না

মিলি ও তার স্বামী মন্দার সম্প্রতি গিয়েছিলেন ওই থেরাপিস্টের কাছে। রমণ-সুখে বঞ্চিত এই দম্পতি। স্বামী মন্দার অকপটে স্বীকার করেছেন, তাঁরা পরস্পর টান বোধ করেন না। একই বিছানায় রাতের পর রাত কাটিয়েও তাঁরা যেন দুই মেরুর বাসিন্দা। জীবনসমুদ্রে তাঁরা যেন দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। মিলি মাঝে মাঝে বলেই ফেলে সে আরো ভালবাসার প্রত্যাশী। কিন্তু তার স্বামীটি যখন বহু বাসনায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়, তখন তার গা রি রি করে ওঠে। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয় মিলি। মন্দারের মনে হয় যৌনাচারেই বুঝি ঘেন্না ধরে গেছে মিলির।

আসলে কিন্তু তা নয়। মিলি নিজেও মনে করে না সে রমণ-বিমুখ। তবে কেন এমনটা হয়। মিলির মুখ থেকেই শোনা যাক উত্তরটা। মিলি মনে করে মন্দারের ভালবাসাটা রমণ-কেন্দ্রিক। শোয়ার সময় ছাড়া ভালবাসার ছিটে ফোঁটা দেখা যায় না মন্দারের মধ্যে। 'ও' যখন আমাকে জাপটে ধরে বেপরোয়া চুমু খেতে থাকে, বলতে থাকে তুমি খুব সুন্দরী, এমনটা আর দেখিনি, তখনই আমি বুঝতে পারি 'ও' কি চাইছে। পরের ধাপটা ভেবেই আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। মাঝে মাঝে মুড থাকলে সাড়া দিই।

এ ধরনের সমস্যা দুঃখজনক হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক। বেশিরভাগ মেয়েই চায় যৌনাচারের সময়টুকু ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে যে বিরাট সময়টা পড়ে থাকে সেই সময় স্বামীর ভালবাসাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে। সেটা না হলেই ছন্দপতন। সে জন্যই স্বামী দেবতাটিকে একটু সজাগ হতে হবে। বউ বেচারি রান্না ঘরে একা বসে ঝোল-ঝাল-চচ্চড়ি পাকাচ্ছে, আর আপনি একটা খবরের কাগজ বা থ্রিলার মুখে দিয়ে সটান। কেন বাপু যান না একটু, রাতে যা যা বলেন তা না হয় রান্নাঘরেই একটু শুনিয়ে এলেন। ক্ষতি কি! বরং রাতের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল। সেই অনেকটা প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার মত। রান্নাঘরে গিয়ে একটু বলুন না – আহা

বউ বেচারি রান্না ঘরে একা বসে ঝোল-ঝাল-চচ্চড়ি পাকাচ্ছে, আর আপনি একটা খবরের কাগজ বা থ্রিলার মুখে দিয়ে সটান। কেন বাপু যান না একটু, রাতে যা যা বলেন তা না হয় রান্না ঘরেই একটু শুনিয়ে এলেন। ক্ষতি কি! বরং রাতের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল।

গরমে একদম তেতে গেছ গো। দাও তোমাকে একটু পেঁয়াজ ছাড়িয়ে দিই। তা হলেই দেখবেন বউ গলে জল। যথা সময়ে আপনাকে আর ভালবাসার অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে না।

মেয়েরা ফুসলানো ভালবাসে

মেয়েদের ফুসলানো পুরুষের স্বভাব। মেয়েরাও চায় তার প্রাণের মানুষটি তাকে ফুসলাক। পুরুষ নারীকে যত ফুসলাবে, নারী তত তার ওজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। নিজেকে খুব মহার্ঘ মনে করবে। আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীকে বলত 'আহা তোমাকে একদম ডায়নার মত লাগছে।' স্ত্রীটি কপট রাগের ভান করে বলত – 'মরণ হয় না'। মুখে যাই-ই বলুক, ভালবাসার পাশুপত অস্ত্রে সে যে ঘায়েল হয়েছিল তা পরে বন্ধুটির কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। সেই থেরাপিস্ট ভদ্রলোক মনে করেন, স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে যত না কাছে টানা যায়, তার চেয়ে তাকে বেশি টানা যায় স্তুতি করে।

> সবুজ আলোয় নিসর্গ রচনা করে বসুন মুখোমুখি। গল্প করুন। দেখবেন গল্পের গরু ইন্দ্রিয়ে টান ধরিয়েছে এক সময়। তারপর.....।

নারীর সাড়া পেলে পুরুষ নিজেকে সার্থক মনে করে

যৌন আবেদনে সাড়া না পেলে একজন পুরুষের মানসিক অবস্থা কেমন হয় তা নারীর পক্ষে আঁচ করা সম্ভব নয়। কোনো স্বামী যখন তার স্ত্রীর কাছে যৌন আবেদন রাখে, তখন তার সমস্ত আবেগ এবং শারীরিক চাহিদা দিয়েই রাখে। এই সময় নারীর কাছ থেকে আন্তরিক সাড়া পেলে সে তার পৌরুষ সম্পর্কে গর্বিত হয়ে ওঠে। আর প্রত্যাখ্যাত হলে তার পুরুষ-সত্তায় আঘাত লাগে। প্রত্যাখানের জ্বালায় জ্বলে ওঠে সে। বলে – 'আমি তোমাকে চাই না' 'ভাল বাসি না'। ধরা যাক স্বামী ভরা মনে নিতে এসেছেন স্ত্রীর কাছে, স্ত্রীর দেওয়ার মন নেই। স্ত্রী কি তখন – 'যাও সব সময় ভাল লাগে না', বলে পাশ ফিরে শোবেন ? তা না করে যদি বলে – 'সারাদিন বড় ধকল গেছে এখন থাক লক্ষ্মীটি।' ভোরবেলার দিকে দেখা যাবে। লাখ কথার এক কথা। ভোরের প্রতীক্ষায় চোখ বুজলেন স্বামী।

যৌন-সম্পর্ক পারস্পরিক দ্বেষ কমায়

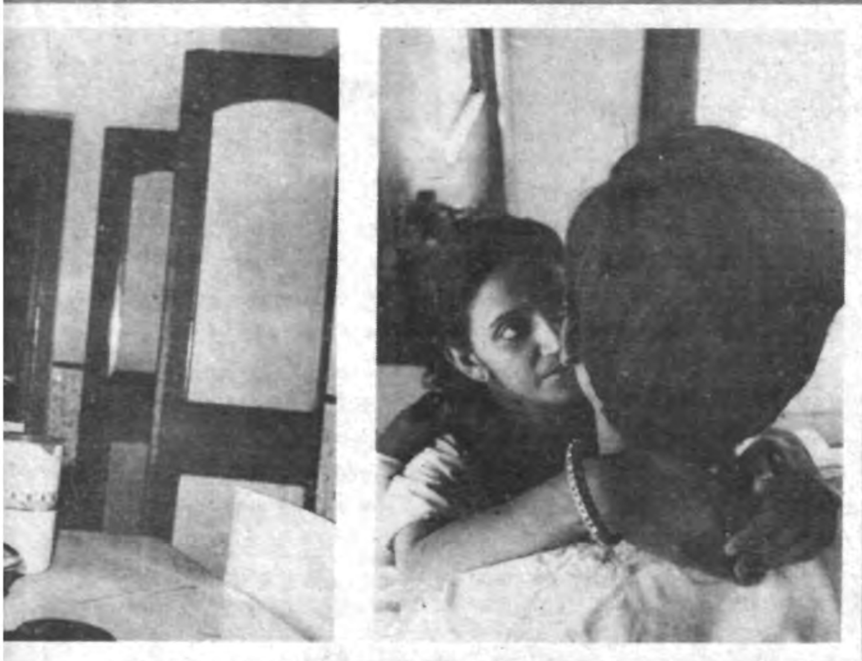
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি লাগতেই পারে। কিন্তু সেটা যখন হিংসা বা



দ্বেষের পর্যায়ে চলে যায় তখনই বিপদ। এমন স্ত্রী আছেন যিনি স্বামীর কাছে উন্মুক্ত হতেও গররাজী। গররাজী ছিলেন না। হঠাৎ হয়েছেন। কেন হয়েছেন ? একদিন স্বামীর টেবিলের ড্রয়ার খুলে স্ত্রী পেয়েছেন, নগ্ন নারীর ছবিসহ পত্রিকা। দেখেই স্ত্রী বেচারির মুখ গোমড়া। ও, তলে তলে এত। একটা প্রতিহিংসার বিষ ছড়ায় স্ত্রীর মধ্যে। কেন বাপু অত লুকিয়ে চুরিয়ে নগ্ন মেয়ের ছবি দেখা কেন ? দেখতেই যদি হয় স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে দেখুক না। তবে এই ধরনের বিদ্বেষের আগুনে জল ঢেলে দেওয়া যায়, যদি আপনারা ভালবাসার চাবিকাঠি দিয়ে দেহের দরজা খুলে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যান।

আপ রুচিমে চলো

সেক্সো-থেরাপিস্ট বলেছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী তার রুচি স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে এমন জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেন যে সম্পর্কই ভাঙার দাখিল। উল্টোটাও হয়। এমনি এক দম্পতি মন্দিরা আর অনুময়। মন্দিরার কোনো কিছুই পছন্দ নয় অনুময়ের। 'এ কেমন শাড়ি পরেছ। ক্যাটকাটে রঙ। হাল্কা রঙের শাড়ি পরবে। কি পাউডার মেখেছ – এমন উৎকট গন্ধ। ল্যাভেন্ডার ডিউ মাখ। চুল বেঁধেছ যেন কাকের বাসা। কান ঢেকে এলো খোপা বাঁধ, খুব ভাল লাগবে তোমাকে।'



ফটো : সৌরভ রায় বর্মন

একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে মন্দিরা। এ ভাবেই মন্দিরা আর অনুময়ের মাঝখানে মাথা তুলেছে চীনের প্রাচীর। এ এক ধরনের সমস্যা। এর ঠিক বিপরীত সমস্যাও আছে। এমন স্বামী-স্ত্রী আছেন যাঁরা কেউ কারো ব্যাপারে মাথা ঘামান না। কাছে থেকে দূর রচনা করে। কিন্তু এমনটা হবার কথা তো নয়। 'যেই চোখ দিয়ে তুমি আমায় প্রথম দেখেছিলে/কিছু না বলে/ আনমনে আবেশে বিভোর হয়েছিলে' — সেই আবেশ এখন নেই কেন ? যে চোখ দিয়ে প্রথম দেখেছিলেন, সে দেখার চোখটা হারিয়ে ফেললেন কেন ? 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে' —এই কামনাকে লালন করলে মন্দিরা-অনুময়ের মত দশা হবে না কারোর।

আরো একটু বস

দয়িতাকে উষ্ণ আলিংগনে আবদ্ধ করলেন দয়িত। দয়িতাও সংগে সংগে তার তনুশ্রী সঁপে দিলেন। তাতেই ধন্য হল অংগ, পূর্ণ হল অন্তর, এমনটা ভাবার কারণ নেই। কারণ স্বামী-স্ত্রীর যৌনাচারেরও একটা ব্যাকরণ আছে। যৌনাচারের কামনাকে ধীরে ধীরে লালন করতে হয়। তাতে কামনার তীব্রতা বাড়ে। মিলনের আকাংক্ষা অদমনীয় হয়। বহু বাসনায় প্রাণপণে চাওয়ার পর, ইপ্সিত বস্তুটি যখন নাগালের মধ্যে আসে তখন যে বিহ্বলতা আসে তা স্বপ্নের মত। জাগতিক লাভ-ক্ষতির নিরিখে তা বিচার করা যায় না। সেই নৈকট্য লাভের জন্য রাতের খাবার শেষ করেই সটান বিছানাশ্রয়ী না হয়ে, সবুজ আলোর নিসর্গ রচনা করে বসুন মুখোমুখি। গল্প করুন। দেখবেন গল্পের গরু ইন্দ্রিয়ে টান ধরিয়েছে এক সময়। তারপর.......।

ভালবাসায় ভোলাব

যৌন পরিতৃপ্তির প্রধান চাবিকাঠি হল ভালবাসা। প্রেমহীন, ভালবাসাহীন যৌনাচার অশ্লীলতার সামিল। রূপ, যৌবন, ধনসম্পদ কোনো কিছুই পারস্পরিক সম্পর্ককে সেই স্তরে নিয়ে যেতে পারে না, যা ভালবাসা পারে। তাই রূপে না ভুলিয়ে ভালবাসায় ভোলান। হাত দিয়ে না খুলে, গান দিয়ে দ্বার খোলান। কারণ শারীরিক ঘনিষ্ঠতা যদি মানসিক নৈকট্য ও আবেগের পরিপূরক না হয় তবেই বিপত্তি। শারীরিক ও মানসিক নৈকট্যের ভারসাম্য হলেই চরম তৃপ্তির স্বাদ উপভোগ করা যায়। এই ভারসাম্য যেখানে থাকে না সেখানেই অতৃপ্তি, অশান্তি, অ-সহাবস্থান। সেটা নিশ্চয় কাম্য নয়। তাই মন দিয়ে দেহ ছুঁতে হবে। গালিবের ভাষায় বলি : 'আমি তুমি হয়ে যাই, তুমি আমি হয়ে যাও, পরে যেন বলতে না পারি তুমি আমি আলাদা।'. □

একই বিছানায় রাতের পর রাত কাটিয়েও তাঁরা যেন দুই মেরুর বাসিন্দা। জীবনসমুদ্রে তাঁরা যেন দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

কবিতা

এখন ভয়ংকর সময়

ধনঞ্জয় দাশ

এখন সেই ভয়ংকর সময়
যখন অন্ধকার দেয়ালের আড়ালে
সব কিছুই চাপা পড়ছে;
আমরা কেউ কোনো মুখ
এখন আর দেখতে পাচ্ছি না,
ভাই ও বন্ধু কে কোথায় যাচ্ছে
তা ঠাহর করাও দুঃসাধ্য।

এখন সেই ভয়ংকর সময়
যখন বিচারপতিকে ফাঁসিতে লটকে
খুনীরা হাসতে হাসতে
কাঠগড়ার কার্নিশ টপকে
ফুলবাবুর মতো চলে যাচ্ছে,
আর অর্বাচীন লেখক
রাত জাগার ক্লান্তি চোখে মেখে
কবিতার শরীরে খুঁজছে যৌনতার স্বাদ।

এখন সেই ভয়ংকর সময়
যখন চকচকে বস্তুই সোনার সম্মান পাচ্ছে,
উৎপাদনের উপকরণ নাড়াচাড়া না করেও
'ক্যাপিটাল'-এর ক্লাস নিচ্ছেন তুখোড় তাত্ত্বিক,
আর এক কদম আগে পা না বাড়িয়ে
দু-কদম পিছু হটার মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে
কারা যেন চিৎকার করছে – বিপ্লব......বিপ্লব।

এই নেতির রাজ্যে অন্ধকারের ঘাড় মটকে
ভয়ংকর সময়কে কে রুখতে চায় আজ, কে?
আলোর বল্লম হাতে
তারা আজ ফেটে পড়ুক ঝড়ের গর্জনে।

কথা ছিল

সৌমিত্র বসু

কথা ছিল, সকালে স্নানের পরে অন্যমনে একা তুমি উঠোনে বসবে
চুল ছুঁয়ে ঝরে যাবে ঘুমের ভিতর থেকে গাঢ় যত জল;
বেলের কুঁড়ির মত একটি আলোর শ্বাস লেগে থাকবে কানের লতিতে –
হাঁটুতে চিবুক থাকবে যেন কোন ঢেউ তার কাজ ভুলে গেছে।

কথা ছিল, দূরের প্রদেশ ভেঙে দীন আমি ঘরে ফিরে এলে
ছবি থেকে উঠে আসবে মায়ের মতন এক শান্ত নদী হয়ে –
নতজানু হতে খুব ইচ্ছে হবে, পায়ের ঠান্ডা মাখি চুলে,
পেরে উঠব না – শুধু অমন দুচোখে খাব মগ্ন দুই চুমো।

কথা ছিল, রাত্রি হ'লে দুজনে উৎসব করে এই তুচ্ছ কবিতা পড়ব।

অপেক্ষায় আছে, অপেক্ষায়

অশোক মন্ডল

দরোজায় কান পেতে নিঃশব্দে উন্মুখ
মোহান্ধ খিলান।

চৌকাঠের আকুলি-বিকুলি ভেঙে যে গেছে
সে কি ফিরে আসে
ফেরে? ভুল পোশাক হাওয়ায় উড়িয়ে
ছোঁয় নিবেদিত পাপোশ?

নতমুখে এককোণে উপুড় কলস।
সেও অপেক্ষায় আছে, কখন জড়াবে তাকে
তৃষ্ণার্ত দুটি হাত।

আজ

উদয়ন ভট্টাচার্য

মেঘের অন্বেষণে বেলা যায় ক্ষুব্ধ
অপমান উপেক্ষা ও স্বার্থের এই
সংঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবো
ও দিতে চাই বলে স্বপ্নময়
শীত ও সবুজ উপত্যকাতে দাঁড়ানো
তোমার খুব কাছাকাছি বৃত্তে
এবার আমাকে ডাকো।



ছবি : তরুণ দাস



শুভ নববর্ষ

এপারে হালখাতা, ওপারে উৎসব

চৈত্রের ঝড়ো বাতাসের সংগে সংগে বয়ে আসে বৈশাখের বারতা। বৈশাখের পহেলা দিনটি বাংলা নববর্ষ বলেই খ্যাত। এদিন মন্দিরে পূজোপাঠ আর ব্যবসায়ীর গদিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম করে নতুন খাতার উদ্বোধন। সংগে খরিদ্দারদের মিষ্টিমুখ করানো। এপার বাংলার বহু পরিচিত এ দৃশ্যের সংগে ওপার বাংলার দৃশ্যটা মেলে না। ওপার বাংলায় নববর্ষ দোকানের হালখাতা নয়, জাতীয় জীবনের মহাউৎসব। এপার-ওপার – দুই বাংলার নববর্ষ কেমনভাবে উদ্‌যাপিত হয়, তারই মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন মিহির কর্মকার



বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে বাংলা সন-তারিখের ব্যবহার কমে গেলেও, সংগত কারণেই কমেনি এর গুরুত্ব, এর মর্যাদা। সমাজে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বাংলা মাস-তারিখ কোন কিছুরই খবর রাখেন না। রাখার প্রয়োজন হয় না। দুর্গাপুজো অক্টোবরের কত তারিখে সেই খবরটাই সবাই রাখেন। আশ্বিনের কত তারিখে মহাষষ্ঠী, তা ক'জন মনে রাখেন

তবে দুটি তারিখ বাঙালির মনে থাকে। একটি বাংলা নববর্ষ, অন্যটি পঁচিশে বৈশাখ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে ও প্রয়োজনে বাঙালিকেও ইংরেজি বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে হয়। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণপত্রে বাংলা তারিখের সংগে নিমন্ত্রিতের সুবিধের জন্য লিখে দিতে হয় ইংরেজি তারিখ। তা সত্ত্বেও বাঙালির চিন্তা, চেতনা ও মননে বাংলা মাস ও ঋতুর গুরুত্ব আজও আগের মতই অপরিবর্তিত। এ প্রসংগে সাহিত্যিক সুনীল গংগোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। তিনি বলেছেন, ...বাংলা মাস ও ঋতুর একচ্ছত্র আধিপত্য আছে এক জায়গায়, বাংলা কবিতায়। সেখানে এখনো কালবৈশাখীর বদলে মার্চ মাসের ঝড় আসেনি। আশ্বিনের সাদা মেঘের বদলে সেপ্টেম্বরের আকাশ বললে ঠিক ছবি ফোটে না। কোজাগরি পূর্ণিমা ঠিক কোন মাসে হয় খেয়াল না থাকলেও কবিরা ঐ রকমই লেখেন। জ্যৈষ্ঠের দুপুর না লিখলে ঠিক খাঁ খাঁ গরম বোধ হয় না। ইংরিজি মতে তো হেমন্তকাল বলে কিছু নেই। কিন্তু বাংলায় আছে।' বাঙালির জীবন থেকে বাংলা বর্ষপঞ্জির গুরুত্ব একেবারে হারিয়ে যায়নি। তাই তো বাংলা নববর্ষের দিন বাঙালি মাত্রেই অনুভব করে একটি বিশেষ চেতনা, জীবনকে নতুন করে শুরু করার অনন্য তাগিদ। এদিনে ছোটরা গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নেয় যাতে গোটা বছরটা ভাল যায়, স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনায় স্ত্রী ছোটেন মন্দিরে পুজো দিতে, সন্তানের 'শুভ হোক' – এই আকূতি জানান গর্ভধারিণী জননী। এমনি করেই শুরু হয় আমাদের বাংলা নববর্ষ – বংগাব্দের প্রথম প্রত্যূষ, 'পহেলা' বৈশাখ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এদিনের আবাহন করেছেন অন্তর-স্বরে – 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।' আহ্নিক ও বার্ষিক গতির চক্রবৎ নিয়মে প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে এ দিনটি। দিনের চরিত্র অনুযায়ী ৩০ চৈত্র ও ১ বৈশাখের মধ্যে কোন তফাত নেই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত কোন কিছুতেই উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন নেই। তবু ১ বৈশাখের মহিমাই আলাদা। ৩০ চৈত্র সংক্রান্তির দিন। সংক্রান্তি মূলত সংক্রমণ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ সঞ্চরণ বা চলন। কালের গতি অবিরাম। চলছে তো চলছেই। বর্ষ শেষের শেষ দিনটি হল এই সংক্রান্তি। এই দিনটি মনে করিয়ে দেয় – তোমার জীবন থেকে আরেকটি বছর ঝরে গেল। শুরু হল আরেকটি নতুন বছর। বিশ্বের সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষের উদ্বোধন ঘটে মহা ধুমধামে। নতুন বছরকে সবাই আহ্বান জানায় নববস্ত্রে, অচঞ্চল চিত্তে, হাসি মুখে এবং আশাবাদী মানসিকতায়।

মুসলিম শাসনামলে বাংলা তথা ভারতে মুসলিম চান্দ্রবর্ষ বা হিজরি সন অনুসরণ করা হত। হিজরি সনের প্রথম দিন খোলা হত নতুন হিসেবের খাতা। প্রজা সাধারণ ওইদিন সব বকেয়া রাজস্ব জমা দিতেন। হিজরি **সন চান্দ্রগতির ওপর নির্ভরশীল।** তাই এর দিন সংখ্যা সূর্যের আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতি অনুযায়ী সার্বজনীনভাবে গৃহীত ৩৬৫ দিনের বছরের চেয়ে ১১ দিন কম। এর ফলে প্রতি বছর হিজরি নববর্ষ ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। রাজস্বের প্রধান উৎস যেহেতু ফসল, তাই নববর্ষে রাজস্ব আদায়ে হিজরি সন অনুসরণ করাতে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এজন্য সম্রাট আকবর হিজরি সনের পরিবর্তে ৩৬৫ দিনের বংগাব্দকেই সরকারি সন হিসেবে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ফলে গুরুত্ব বাড়ে 'পহেলা' বৈশাখের, নতুন তাৎপর্যে বর্ণময় হয়ে ওঠে বাংলা নববর্ষ।

বিগত চারশ' বছরে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনে নানা বৈচিত্র্য এসেছে। সদানন্দ বংগভূমিতে উৎসব তো জীবনেরই আরেক নাম। তাই তো রসিকজনে বলেন, বারো মাসে তেরো





পার্বণ। শুধু বঙ্গভূমি নয়, বিশ্বের সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষকে বরণ করা হয় উৎসবের মাধ্যমে। উৎসব হল মনুষ্যজীবনের বড় ধর্ম। এই ধর্ম ও জীবনের প্রতি নিষ্ঠা বাঙালি নববর্ষকে আবাহন করে স্নিগ্ধ বিশ্বাসের অযুত অঞ্জলিতে।

ধর্মবিশ্বাসে বিভক্ত বাঙালি জাতির আবাহন পদ্ধতিতেও সংগত বিভাজন লক্ষণীয়। হিন্দু বাঙালির বিশ্বাসে বাংলা নববর্ষ শুধুমাত্র বর্ষশুরুর প্রথম দিন মাত্র নয়। অন্য আর দশটি মাংগলিক পার্বণের মত নববর্ষও ঈশ্বরের শ্রীচরণে নিবেদিত একটি শাস্ত্রসম্মত মহাতিথি। সবরকম শুভ উদ্যোগ ও নবযাত্রার মহালগ্ন হল 'পহেলা' বৈশাখ। এদিন মন্দিরে মন্দিরে পুজো-আর্চার সংগে সংগে গৃহদেবতা কুলদেবতাকেও জানানো হয় বিশেষ প্রণতি। ব্যবসায়ীর গদি ঘরে সিদ্ধিদাতার সিদ্ধি কামনায় আয়োজন



হয় গণেশ পুজোর। কোথাও লক্ষ্মী গণেশ একই সংগে। শুরু হয় নতুন খাতায় হিসেব নিকেশ। ঐদিন কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরে ভিড় হয় প্রচন্ড। পুজো দেবার এবং মায়ের আশীর্বাদ নেবার ভিড়। বছরের প্রথম দিনটিতে মায়ের আশীর্বাদ সব সন্তানেরই কাম্য। ভিড় বাড়ে ব্যবসায়ীদের। তাঁদের নতুন খাতা মায়ের শ্রীচরণে একটু ছুঁইয়ে নেওয়ার ভিড়। শুধু কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বর নয়, গোটা বঙ্গভূমিতেই এ রীতি চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সর্বত্রই মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন হয় এদিনে।

নববর্ষের সংগে হালখাতার সম্পর্কটি বড়ই নিবিড়। ব্যবসায়ীর গদিতে, দোকানে এদিন থাকে উৎসবের আমেজ। খদ্দেররা আসেন মিষ্টিমুখ করতে, বাকি টাকা শোধ দিতে। এদিন গোমড়ামুখো দোকানিও দাঁত বের করে রাখেন। হাসিমুখে আপ্যায়ন করেন খদ্দের নাম্নী লক্ষ্মীকে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। '.....ছড়াক করে একটু গোলাপজলের ছিটে এসে পড়ত গায়ে। ভারী চমকে উঠতাম প্রথমে। ম ম' করে গন্ধটা অবশ্য জড়িয়ে ধরত তৎক্ষণাৎ। মনটা ভাল হয়ে যেত। তখনও ফুল দিয়ে সাজানোর রেওয়াজ ছিল দোকান ঘর। নতুন ফরাস পাতা, চেয়ার, টেবিল, লাল টকটকে মলাটে লম্বাটে খেরোর খাতা, হাস্যমুখ দোকানি। হালখাতা আসলে যে বকেয়া টাকা শোধেরও দিন সেটা ছেলেবেলায় বুঝতে পারতাম না। সংগে বড়রা কেউ যেত। আমাদের লক্ষ্য থাকত শরবতের গেলাস বা মিষ্টির প্লেটের দিকে।'

সময়ের সংগে সংগে হালখাতা উৎসবেরও রীতি পাল্টেছে। এখন আর কাউকে বসিয়ে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়ানো হয় না। এখন দেওয়া হয় প্যাকেট। সংগে ক্যালেন্ডার। আগে ক্যালেন্ডারের তেমন প্রচলন ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বাংলা সংস্কৃতিতে উৎসব অনুষ্ঠানের অনেকটাই পূর্ণাংগ রূপ পেয়েছে ইংরেজ শাসনামলে। সে সময় জমিদারদের সেরেস্তায় নববর্ষ উৎসব পালিত হত মহা ধুমধামে। অগণিত প্রজা ওইদিন জমিদার বা রাজবাড়ির কাছারিতে জমায়েত হতেন। প্রথামত প্রজারা রাজা বা জমিদারকে প্রণাম করে তাঁর চরণে একটি বা দুটি টাকা রাখতেন। এই টাকা বা ভেট রাজা ও প্রজার সুসম্পর্কের প্রতীক। নববর্ষের এই অনুষ্ঠান 'পুণ্যাহ' নামে পরিচিত। পুণ্যাহের আরেকটি দিক হল, ওই দিন রাজা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন সকলকে আশীর্বাদ করতেন।

নববর্ষে গ্রামে গঞ্জে আয়োজিত হত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। পালা গান, কীর্তন, রামযাত্রা, রামায়ণ এসবের আয়োজনে মুখর হত নববর্ষের রাত স্বাধীনতার আগে এইসব অনুষ্ঠানের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রামের জোতদার, জমিদার ও তাঁর তাঁবেদারগণ। হিন্দু, মুসলমান সবাই নববর্ষের এই আমোদ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন যথার্থ প্রাণাবেগ নিয়ে

দেশ ভাগের পর বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন মূলত বাঙালি হিন্দুর একচেটিয়া পর্বে পরিণত হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার

পূর্ববংগের মুসলমান বাঙালির মনে এনে দেয় বিভ্রান্তি। নববর্ষ উৎসবেও তাঁরা খুঁজে পান 'বিজাতীয় সংস্কৃতির আঁশটে গন্ধ'। এই প্রসংগে সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি – 'বাঙালি মুসলমান উৎসব পরায়ণ গোত্র নয়। যে গুটিকয় উৎসব



পুনরাবর্তিত হয় আমাদের জীবনে প্রতিবছর, তা স্বদেশের মাটি থেকে ওঠেনি। ওঠেনি আমাদের যৌথ অবচেতনা থেকেও। তাই ওই উৎসবরাশিতে আমরা যোগ দিলেও তা ঢুকতে পারে না আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও চিত্তে। একবেলাকার নিরুপায় বস্ত্রের মতো ওই উৎসবগুলি খুলে ফেলি শরীর থেকে দুপুর গড়াতে না গড়াতে। ওগুলির শাসনও বেশ কঠিন-কঠোর, তা বুকের ভেতর উল্লাস সঞ্চারের চেয়ে মনের ভেতরে ভীতি ছড়িয়ে দেয় অনেক বেশি। কিন্তু উৎসব মাত্রই আনন্দোৎসব, তাতে থাকা উচিৎ জীবন মৃত্যু ভোলানো উল্লাস।' লেখক হুমায়ুন আজাদের দুঃখ – 'এসব আমাদের জীবনে নেই। কেন না আমরা সংস্কৃতিহীন দেয়াল সর্বস্ব, সন্দেহপ্রবণ, আনন্দ ও শ্রেণীবিদ্বেষী এবং মর্মমূলে ভয়ংকর পাপী। আমাদের দেশের সংখ্যালঘু গোত্রগোষ্ঠীরও সংস্কৃতি আছে, নেই আমাদের। নাচ গান বাদ্য আমাদের জীবনের অংশ নয়, যেমন অংশ যে কোন উপজাতির।' দেশভাগের পর পূর্ববাংলার বাঙালিকে বাঙালি-হিন্দুর সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার বিরুদ্ধেই লেখকের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার। ওই সময় বলা হত, বাঙালি সংস্কৃতি আসলে হিন্দুর সংস্কৃতি। মুসলমানদের পক্ষে ওই সংস্কৃতি লালন করা অনুচিত। পরিবর্তন আসে ষাটের দশকে। গোটা পূর্ববাংলাকে কম্পিত করে,

মৌলবাদীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শুরু হয় পহেলা বৈশাখে নববর্ষের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল ঢেউয়ে পূর্ববাংলার নগর-গ্রাম একাকার হয়ে যায়। ভেদাভেদ টুটে যায় কে হিন্দু, কে মুসলমান। তখন সবার একই চেতনা – আমরা সবাই বাঙালি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এই উদ্দাম প্রকাশিত হয় মূলত ১৯৬৬ সাল থেকে। পূর্ববঙ্গের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী থেকে যে সম্পূর্ণ আলাদা, একথা সর্ব প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন শেখ মুজিবর রহমান। পূর্ববঙ্গবাসীরা যে বাঙালি সে কথা পুনরায় তিনিই স্মরণ করিয়ে দেন। বাঙালিকে বাঁচাবার জন্য মুজিবের ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয়যাত্রা শুরু।

আজকের বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ জাতীয় উৎসবের মর্যাদায় অভিষিক্ত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ আসে শাস্ত্রের হাত ধরে, ধর্মীয় অনুভূতিকে ভর করে। অন্যদিকে সার্বভৌম বাংলাদেশে আজকের প্রেক্ষাপটে নববর্ষ উৎসব যথার্থই সামাজিক এবং চরিত্রের দিক থেকে পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ। প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে বাংলাদেশে নববর্ষের সূর্যোদয় হয়। ঢাকার সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় রমনায়। ওইদিন গোটা বাংলাদেশেই চলে নানা আনন্দানুষ্ঠান। জেলায় জেলায় সরকারিভাবে আয়োজিত হয় 'বর্ষবরণ' উৎসব। সব সাংস্কৃতিক সংস্থাই এদিন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। রেডিও, টিভি-তে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করে বিশেষ ক্রোড়পত্র। অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন বেরয় নববর্ষের বন্দনায় মুখর হয়ে।

এরই পাশাপাশি চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতা উৎসব। পুরনো রীতিতে বকেয়া পরিশোধের অনুষ্ঠান। চলে খদ্দেরকে মিষ্টিমুখ করানো। নববর্ষের পুণ্যতিথিতে বাঙালি হিন্দুদের অনেকেই এদিন গঙ্গা স্নান করেন। বাংলাদেশে যেহেতু গঙ্গা নেই, তাই নদী বা পুকুরেই এই স্নানপর্ব সেরে পুণ্যার্থীরা মন্দিরে যান পুজো দিতে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এখনো বৈশাখী মেলা বসে। ওই মেলায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষই যোগ দেন দলে দলে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেও এদিন মেলা বসে। তবে বাংলাদেশ পহেলা বৈশাখে যেভাবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গ সেভাবে উদ্দাম হয়ে ওঠে না। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ দু জায়গাতেই এদিন থাকে সরকারি ছুটি। এই ছুটি উপভোগের জন্য বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন, পশ্চিমবঙ্গে তা হয় না। এখানে মানুষ ঘরের বাইরে ছুটে আসেন ইংরেজি নববর্ষে – নিউইয়ার্স ডে-তে। পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষে গঙ্গাস্নান, মন্দিরে পুজো, দোকানে হালখাতা, কিছু ছোটখাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এসব করা হলেও, সামগ্রিক বিচারে নববর্ষ-উৎসব বাংলাদেশেই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলিও এদিন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। রেডিও-টিভিতেও নববর্ষ স্মরণে প্রচারিত হয় একটি দুটি অনুষ্ঠান।

কলকাতার যাত্রাপাড়ায় প্রতিটি গদিতে এদিন পুজো হয়। অবশ্য কোন গদীতে অক্ষয় তৃতীয়াতেও পুজো বা হালখাতার উৎসব হয়। খেলার মাঠে বারপুজোও করা হয় ঐদিন। মোহন বাগান, ইস্ট বেঙ্গলের মত ক্লাবের কর্মকর্তারা এদিন ছোটেন কালীঘাটে পুজো দিতে। যাতে বছরের টুর্নামেন্টগুলিতে তাঁর সফল হন।

গৃহস্থের ভিত পুজোর জন্যও এদিনটি শাস্ত্রমতে শুভ। নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনও হয় এদিন। □

টান

শান্তা চক্রবর্তী



মানুষের মন ভারী অদ্ভুত। সে কখন কিসে মজে যায় তা বোঝা খুবই মুশকিল। সামনে সোজা রাস্তা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ। আর এই শব্দই যেন তার মনটাকে হঠাৎ পিছনে নিয়ে ফেলল। ঢের দিন আগে। সে সময়ের কথা শৈল প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

মফস্বল শহর। যার সংগে শৈলর দীর্ঘদিনের পরিচয়। অথচ সেই শহরটাই সে চিনতে পারছে না। মাত্র দশ বছরে চেহারা কত বদলে গেছে। কত ঘর-বাড়ি। নতুন নতুন রাস্তা। দোকান, ইলেকট্রিকের আলো। শৈল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অবাক চোখে। অবাক হবারই কথা। দশটি বছর যেন পরিচিত সবকিছু শুষে নিয়েছে।

বিয়ের পর এই আসা। তাও একা। শৈল ট্রেন থেকে নেমেই চমকে গেছে। কোথায় সেই মালতীপুর। শান্ত ছোট্ট শহর; নিরিবিলি উত্তাপ। বাড়িতে পা দিয়েই নিজের মনের কথা বলে ফেলেছে মাকে। 'জান মা, স্টেশনে নেমে প্রথমেই মনে হয়েছিল ভুল করলাম না তো

'কিসের ভুল!' মেয়ের কথায় মাও বিস্মিত।

'সব কেমন বদলে গেছে।'

'তা যা বলেছিস শৈল।' মা হেসে বলেন, 'কত লোকজন এখন, কত বাড়ি

উঠল। ফাঁকা জায়গা বলতে আর কিছু নেই।'

'হাঁপিয়ে, যাবার অবস্থা –' শৈল হাত পা ছড়িয়ে দিল। 'গঙ্গার ধারটাও কী এমন – শিবমন্দিরের কাছটা ?'

'ওইটুকুই যা ফাঁকা আছে। আর সব জায়গায় গিসগিস করছে লোক। আরো তিনটে স্কুল, দুটো কলেজ হয়েছে।' হঠাৎ কথা বলতে বলতে মার কী মনে পড়ে যায়। মেয়ের দিকে একটু তাকিয়ে তিনি কী যেন দেখতে পান। অতীতের টুকরো ছবি। 'হ্যাঁরে শৈল, তোর এখানকার মেলার কথা মনে আছে ?'

'মেলা।' শৈল যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শিবরাত্তিরের মেলা। কেন কী হয়েছে ?'

'আজ শুক্রবার –' মা উত্তর দিলেন, 'সামনের সোমবারেই তো শিবরাত্তির। কাল থেকেই তো মেলা বসবে।

'তাই নাকি!' শৈলর মনের ভেতর একটা ফুরফুরে হাওয়া বয়ে গেল। 'এই দেখ মা, আমার একদম মনেই ছিল না।'

'মনে থাকবে কি করে কতদিন বাদে বল তো এলি!'

শৈল হাঁটছে। শেষ দুপুর। শীতের ঝাঁজ কমে এসেছে। বাতাসে কেমন একটা আনমনা ভাব। শৈল একা নয়, সঙ্গে তার ছোট ভাইয়ের বউ।

'দিদি তোমার কি হল বলো তো –' ছোট ভাইর বউ ইতি অনেকক্ষণ বাদে কথা বলে উঠল। 'চুপ হয়ে গেলে যে ?'

'ভাবছি।'

'বাড়ি থেকে বেরিয়েই তো ভাবছ।'

শৈল হাসল। 'তা যা বলেছিস ইতি। আসলে কী জানিস, মার মুখে শোনার পর থেকেই আমার মনে মেলার নেশা ধরেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' ইতি বলল।

কথাটা সত্যি। মায়ের মুখে মেলা কথাটা শোনবার পর থেকে শৈলর মন যেন নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা স্বপ্নের ঘোর চোখে। বুকের ভেতর শব্দ। এখন দূরের শব্দটার সঙ্গে ভেতরের শব্দটা মিশে যাচ্ছে। মানুষের হাঁকডাক, জিলিপি ভাজার গন্ধ, ধুলোর কুয়াশা। সব ঘিরে ধরেছে শৈলকে। সকাল থেকে ইতিকে খোশামোদ করেছে সে। মেলায় সঙ্গী হবার জন্য। ইতি শহুরে মেয়ে। তার কাছে মেলার কোনো টান নেই। ধুলো খেয়ে মরতে সে রাজি নয়। তবু শেষ পর্যন্ত শৈলর কথায় সঙ্গী হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটের পর দুজনে রওনা দিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শৈল চুপচাপ। পথে নামতেই ভাবনায় সে আচ্ছন্ন।

শব্দটা বাড়তে থাকে। যা ছিল গুঞ্জন এখন তা কোলাহল। শৈলরা কাছাকাছি এসে পড়ে। সারি সারি দোকান বসেছে। নানা জিনিস। দূর দূর থেকে দোকানী এসেছে। শৈল লক্ষ্য করে। শিবমন্দির আর গঙ্গার ঘাট আগের মতো ফাঁকা নয়। এখানেও নানা ছোট বড় বাড়ি উঠেছে। পাকা বাজার। বাজারের লাগোয়া মেলা।

পর পর খাবারের দোকান। পাঁপর ভাজা, জিলিপি, ফুচকা। ইতস্তত পান বিড়ি সিগারেটের। শৈল আর ইতি দেখতে দেখতে চলেছে। নানরকম পুতুল খেলনা। চুড়ি-কাচের জিনিস। বাঁশ বেত কাঠ দিয়ে তৈরি সংসারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

'জানিস ইতি, আমাদের সময়ে মেলা এরকম ছিল না।' শৈল বলে উঠল, 'অনেক ছোট ছিল – ফাঁকা ফাঁকা।'

'এখন তো লোক অনেক বেড়ে গেছে দিদি – তাই দোকান ভিড় দুইই বেড়েছে। তখন বোধহয় এত জিনিসও পাওয়া যেত না ?'

'তা যেত না –' শৈল একটু আত্মগত হয়ে বলল, 'আনন্দ বোধহয় বেশি পাওয়া যেত।'

কী নেই মেলায়! শাড়ি জামা থেকে ইমিটেশন গয়না। স্টেশনারি থেকে ছোটখাট ওষুধপত্তর। অঢেল খাবার, ম্যাজিকের তাঁবু। প্রতি রাত্রে যাত্রার আসর।

শৈল চারপাশে ঘুরছিল। কোনো কেনাকাটায় তার মন ছিল না। সাজানো কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। কেবল আচ্ছন্নের মত ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে মাটির পুতুল খেলনা যেখানে বিক্রি হয় সেখানে এসে খুঁটিয়ে সব কটা দোকান দেখছিল। এক একবার দাঁড়িয়ে পড়ছে আবার হাঁটছে। তার ভেতর একটা কীসের তাড়া। তাড়া খাওয়া কোনো কিছুর মতো সে চলেছে। বার কয়েক মেলার এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে বেড়াল ওরা।

'সবই তো দেখা হল দিদি –' ইতি বলল, 'এবার চল বাড়ি ফেরা যাক।' সে এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। দোকানে দোকানে হ্যাজাক, গ্যাস জ্বলতে শুরু করেছে। আধো আলো আধো অন্ধকারে একটা ধুলোর চাদর। সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া। ওদিকটায় গানের আসর বসেছে। তারই রেশ এসে আছড়ে পড়ছে এদিকটায়। শৈল নেশায় বুঁদ হয়েছিল। চটকা ভাঙল ইতির কথায়। 'বাড়ি তো যাবই, এই তো এলাম, আর একটু থাক।'

'শুধু শুধু ধুলো খেয়ে কী হবে ?'

'ধুলো কোথায় রে – ধুলো ছিল সেই তখনকার যুগে।' শৈল ইতির দিকে তাকায়। 'মাথার চুল সাদা হয়ে যেত। মুখের ভেতর কত যে ধুলো ঢুকত তার ঠিক ছিল না।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটু ফাঁকায় এল। মাটির পুতুলের দোকান প্রায় শেষ। দোকানের সামনে থোকা থোকা জটলা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এটা কিনছে, ওটা দেখছে।

শৈল যেন ওদের লক্ষ্য করছিল। ওদের ওই কেনার মধ্যে কেমন এক চেনা সুর। কবেকার এক মুছে যাওয়া কলরব।

'আমাকে ওই ঘোড়াটা দেবে ?'

'কোনটা দিদি ?'

'ওই যে ওইটা –' শৈল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ফ্রক পরা সদ্য কিশোরী একটা মেয়ে হাত বাড়িয়ে আছে।

দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে। দোকানের কিশোর। উসকো-খুশকো চুল। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা। খালি গা, খালি পা।

ঘোড়াটা হাতে তুলে এগিয়ে দিল সে। 'নিয়ে যান দিদি, খুব সস্তা।'

'কত দাম ?'

'এক টাকা।'

'এক টাকা! বলছ কী ?' শৈল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটা কাটা ছবি দেখছে। বিভিন্ন ছবি। বিভিন্ন সময়ের। ভিন্ন ভিন্ন বছরের।

'কী দেব, ভাল আছেন তো, কতদিন বাদে দেখা হল।'

'এক বছর –' মেয়েটির উত্তর। 'গত বছর মেলায় দেখা হয়েছিল। শেষদিন তুমি আমায় একটা প্রজাপতি দিয়েছিলে।'

'মনে আছে। এবারও একটা জিনিস এনেছি – নেবে তো ?'

'কী এনেছ একবারটি দেখাও না।'

'আজ বলব না – যাবার দিন দিয়ে যাব। তুমি আগের চেয়ে কত বড় হয়ে গেছ। চেহারায় কী খোলতাই।'

'এই!' ধমকের সুর গলায়। অথচ কী মিষ্টি।

শৈল শুনতে পাচ্ছে। 'বাজে কথা বললে আমি এক্ষুনি চলে যাব।'

'রাগ করলে, বেশ ওকথা আর বলব না।'

এক মুখ হাসি ছেলেটির। সে আরো বড় হয়েছে। নাকের নিচে গোঁফের পাতলা রেখা। 'তোমরা খুব বড়লোক, তাই না ?'

'আবার বাজে কথা বলছ ?' মেয়েটির চোখে শাসনের চাহনি। 'এইসব বললে তোমার দেওয়া জিনিস আমি নেব না।'

'আচ্ছা, এই কান মলছি আর বলব না। এবার নেবে তো ?'

ঘাড় কাত করে মেয়েটি পালিয়ে গেল। চোখের আড়াল হয়ে তার মনে হল দুহাত ভরে তাকে কেউ কিছু দিয়েছে। কী সে জিনিস !

ইতির ভাল লাগছিল না। সে দাঁড়িয়ে থাকা শৈলকে বলল, 'দিদি বাড়ি যাবে না – ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়।'

'এই তো চল যাব – এখুনি যাব।' শৈল এক কোণে বসে থাকা একটি বুড়োর দিকে এগিয়ে গেল। যেন স্মৃতির ভেতর থেকে চেনা একটা মুখ তার চোখের ওপর এতক্ষণে নেমে এল।

তখন সামান্য রাত হতে শুরু হয়েছে। আকাশে তারারা এক এক করে ফুটছে।

শৈল বুড়ো মানুষটির দিকে এগিয়ে একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ভারী কুয়াশার পর্দা নড়ে উঠল। শৈলর চোখে দূর অতীত। শিবমন্দির। মন্দিরের ভেতর থেকে পুজোর আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘণ্টা বাজছে। অনেক বুড়ি বসে আছে মন্দিরের সামনে। কেউ ধ্যান করছে, কেউ জপ। ছোট একটা মেয়ে তাকিয়ে আছে গংগার ঘাটের দিকে। স্নান করছে কত লোক। নদীর শব্দ। কেমন একটা পবিত্র পবিত্র গন্ধ।

মেয়েটি লক্ষ্য করেনি। একটা কিশোর তার পাশে কখন এসে দাঁড়াল। কাঁধে গামছা। চান করতেই এসেছে। মেয়েটিকে দেখে সে থেমে গেল। তার চোখে অবাক বিস্ময়। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই মনে পড়ে গেল এই সেই মেয়েটি। যাকে কাল বুড়ো বুড়ি পুতুল দুটি দিয়েছিলাম।

'এই শুনছ –'

'কে ?' মেয়েটি ঘুরে তাকায়।

ছেলেটির মুখে হাসি। 'চিনতে পারছ না ? আমি সুধীর। মেলায় মাটির খেলনা বিক্রি করি।'

'তোমার নাম সুধীর ?' চোখ বড় করে মেয়েটি তাকাল। 'বেশ সুন্দর নাম তো। কোথায় যাচ্ছ ?'

'চান করতে এলাম। তোমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। তুমি একা এসেছ ?'

'না।' মেয়েটি বলল। 'সংগে ঠাকমা আছে। মন্দিরে গেছে পুজো দিতে। তুমি আমার নাম জান ?'

'না – ' সুধীর উত্তর দিল। 'জানব কী করে ? তুমি কি বলেছ ?'

'আমার নাম শৈল – ভীষণ বাজে – তাই না ?'

'যাঃ খুব সুন্দর, বিকেলে মেলায় আসবে তো ?'

'হুঁ, যাব।' মেয়েটি একবার চারপাশ দেখে নিল। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি থাকবে তো ?'

'থাকব। এখন যাই –' সুধীর ছটফট করে উঠল।

'আর একটু থাক না।' শৈল মন্দিরের দাওয়া থেকে ঝুঁকে সুধীরের হাত ধরল। অবাক গলায় বলল, 'তুমি নিজে খেলনা তৈরি করতে পার ?'

'পারি –' সুধীর মাথা হেলাল। 'গতবার যে তোমাকে প্রজাপতিটা দিয়েছিলুম, ওটা আমারই তৈরি।'

'তাই বুঝি ! কী সুন্দর হয়েছিল।' কথারা হারিয়ে গেল।

সামনের বুড়ো হঠাৎ শৈলকে বলে উঠল, 'মা আপনি কি চাইছেন কিছু নেবেন ?'

'না, না', শৈল লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'দেখুন আমি একজনকে খুঁজছিলাম, একটি ছেলেকে। অবশ্য সে নিশ্চয় এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তার নাম সুধীর –'

বুড়ো ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল, মনে করতে পারল না। শৈলই খেই ধরিয়ে দিল। 'কাকার সংগে আসত – সেই যে আপনার দোকানের পাশেই বসত, মাটির পুতুল –'

'ওঃ এবার মনে পড়েছে।' বুড়ো স্বাভাবিক গলায় বলল, 'সে তো অনেকদিনের কথা মা। আজ আট বছর হল শম্ভু মারা গেছে। সুধীরের কাকা গো – শম্ভু মারা যাবার পর সুধীর মেলায় আসেনি। তুমি কী মা অনেকদিন বাদে মেলায় এয়েছ ?'

'হ্যাঁ বাবা।' শৈল বলল, 'তা দশ বছর হবে। তখন আমিও ছোট ছিলাম, তারপর এখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি।'

'কী বকবক করছ দিদি – ' ইতি তাড়া লাগাল। তার মোটেই ভাল লাগছিল না। 'রাত হয়ে গেল। বাড়ি চল।'

'দাঁড়া না, অত তাড়া কীসের বাপু ?' – শৈল বিরক্ত হল। তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বলল, 'সুধীর এখন কী করছে বলতে পারেন ?'

'না মা, ওর খবর জানি না। শুনেছিলাম কিছুদিন আগে কারখানায় কাজ নিয়েছে। তা প্রায় বছর পাঁচেক হল। সেই যে গ্রাম ছেড়েছে তারপর ওকে দেখিনি।'

শৈল ইতির হাত ধরল। মুখে শুধু বলল, 'চল, এবার যাওয়া যাক।'

সেই শেষ বছর মনে পড়ে। ফিরতে ফিরতে শৈল চুপ করে আবার ভাবতে লাগল। মেলা ভাঙতে শুরু করেছে। সবাই জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। এবার ফেরার পালা। প্রতিদিনের মত শৈলও এসেছে। সে তখন বেশ বড়। বাড়ি থেকে আপত্তি করা সত্ত্বেও বিয়ের আগে পর্যন্ত তাকে কেউ আটকাতে পারেনি। সে রোজ এসেছে। ছোটবেলায় পুতুল কেনা, পুতুল খেলা প্রাণ ছিল। এখন শৈল বড় হয়েছে। পুতুলের নেশা নেই। অথচ এই মেলার একটা কী যে টান ছিল তা সে বুঝতে পারত না। সে একটা ঘোরে এই মেলায় চলে আসত। চারপাশ ঘুরেফিরে এক সময় মাটির পুতুলের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুধীর এখন তরুণ। অথচ সেই আগের মতোই ছেলেমানুষ। এবারও ওকে বিরাট একটা পুতুল দিয়েছিল। শৈল নেবে না তবু জোর করে দিয়েছে।

'আমি যাচ্ছি।'

'চললি

'হ্যাঁ।' শৈল পা বাড়ায়।

দোকান ছেড়ে সুধীর বাইরে চলে আসে। 'সামনের বার আসছিস তো – আসবি ?' সে শৈলর হাত চেপে ধরে।

শৈল কিছু বলে না। হাতও ছাড়ায় না। আস্তে বলে,'কী লাভ এসে – কী হবে

'কিছু না। দেখা হবে। চোখের দেখা।' সুধীর হাত ছেড়ে দেয়। 'সারাটা বছর এই দেখা হওয়ার চিন্তায় কাটিয়ে দি। তোকে দেখব, দেখতে পাব

শৈলর চোখে জল এসে পড়ে। সে কী যেন বলতে যায়। গলার মধ্যে বেসুরো আওয়াজ ওঠে। কথা বলা হয় না। হাত ছাড়িয়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

এখনও সেই বাড়ির পথ। সেই মালতীপুর। অথচ সেই শৈল না। সেই বয়ঃসন্ধির সময় না। যখন একটা টান তাকে এই মেলায় এনে ফেলত।

রাস্তায় সার সার আলো জ্বলছে। হৈ হৈ করে লোক ফিরছে মেলা থেকে। সাইকেল রিকশার টিং টিং করে বেল। সামনের সিনেমা হলের কাছে হিন্দি গান বাজছে। শৈল এসব কিছু লক্ষ্য করছে না। এত লোকজনের মধ্যেই সে হঠাৎ কেমন একা হয়ে পড়েছে। আচ্ছন্নের মত পা ফেলছে।

দশ বছর বাদে কী এক টানে মালতীপুর এসেছিল শৈল। একটা উৎসাহ উদ্দীপনা তাকে ঘিরেছিল। অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসা। বাড়িতে পা দিতেই মেলার কথাটা তার মনে মা'ই ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তখন আবার অন্য একটা আনন্দ। সেই মেলায় যাওয়ার আনন্দ। দশ বছর আগের একটা পুরনো অভ্যেস যেন শৈলকে নতুন করে নাচিয়ে তুলল।

রাস্তাটা মনে হচ্ছে এখন খুব দীর্ঘ। শৈল হাঁটছে নিস্তেজ হয়ে। অথচ এই রাস্তাতেই কয়েক ঘন্টা আগে সেই কিশোরী বয়সের সুখকে ফিরে পেয়েছিল।

একটা কোমল মুখ, চওড়া বুক, সুন্দর দুটো হাত তাকে হাতছানি দিচ্ছে। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। দুসারি সাদা দাঁতের ফাঁকে ফুলের মত হাসি। শৈলর মনে হচ্ছে একটু আগে আগেই মুখটা সরে সরে যাচ্ছে। আবছা কেমন ভাঙা ভাঙা।



'এই কী দেবে বলেছিলে যাবার আগে শৈলই মনে করিয়ে দিল।

সেবছর মেলায় শেষ দিন। কাল যে যার সব দোকান গুটিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

'তোমার মনে আছে?' সুধীর মুখ তুলে তাকাল। তার সারা মুখে ঘাম। 'ভাবলাম ভুলেই গেছ।'

'ভুলব কেন?'

'সবাই তো ভুলে যায়।' সুধীর উঠে দাঁড়াল। কালো তোরংগের পেছন থেকে একটা প্যাকেট এনে শৈলর হাতে দিল। 'এই নাও।'

কাগজের মোড়ক খুলে ফেলল শৈল। সুন্দর এক জোড়া বর বউ। 'যাঃ এটা কী?'

'সুন্দর না?'

শৈলর মুখ লাল। 'বিচ্ছিরি – খুব বাজে।'

'তবে ফেরত দিয়ে যাও।'

'ইস দিয়ে আবার কেউ ফেরত নেয় নাকি।' শৈল পুতুল ধরা হাত পেছনে সরায়।

সুধীর মাথা ঝাঁকায়। 'না নেয় না। কিন্তু না নিলে কি করব?'

'তাই বলে ফেরত নেবে?'

'আচ্ছা বাবা নেব না, শেষ দিন ঝগড়া কোরো না।'

'ঝগড়া করতে চায় কে – আমি চললুম।' শৈল পা বাড়ায়।

'সামনের বার আসছ তো?'

'কী দেবে?' শৈল বড় বড় চোখ করে তাকায়।

'কী আর দেব বলো – ' সুধীর আনমনা হয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকায়। সেখানে তখন অনেক তারা জ্বলছে। 'সবই তো দিতে ইচ্ছে করে।'

'এমন একটা কিছু দিও যা থেকে যাবে।' শৈল গম্ভীর। সে কী ভেবে যে একথা বলে নিজেই জানতে পারে না।

'কী সে জিনিস?'

'তা জানি না।' শৈল হেসে ওঠে, 'সে তুমি ভেবে নিও।'

শৈল মেলা ছেড়ে চলে আসে। মনের মধ্যে একটা কষ্ট যেন জড়িয়ে যায়।

তারপর আর মেলায় যাওয়া হয়নি। দশ বছর বাদে এই আজ। কষ্টটা যেন এখনো তার সংগে হাঁটতে থাকে।

'দিদি তোমার শরীর খারাপ লাগছে না তো রিকশ নেব?' ইতি পাশ থেকে বলল।

'না না', শৈল ওর দিকে ফিরল। হাসল সামান্য। যদিও নিজেরই মনে হল হাসিটা দায়সারা। 'এই তো এসে গেছি, রিকশ কী হবে হাঁটতে তো বেশ ভালই লাগছে। দেখতে দেখতে যাচ্ছি জায়গাটা কত বদলে গেছে।'

'ওই বুড়ো লোকটার কাছে কার কথা জিজ্ঞেস করছিলে ইতির এবার কৌতূহল হল। সুধীর না কী যেন নাম বললে – কে সুধীর? তোমার চেনা কেউ

ইতি যেন শৈলর বুকের ওপর দিয়ে হাত বোলায়। সে ছোঁয়ায় একটা পুরনো ব্যথা জেগে ওঠে।

'চেনা আবার কী – সে অনেক দিনের কথা।' শৈল উত্তর দিল। 'আমার বিয়ের আগে। বিয়ের আগে পর্যন্ত প্রতি বছরই মেলায় আসতাম। কী পুতুল কেনার বাই ছিল আমার। সুধীর বলে যার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, তার কাছ থেকে প্রত্যেকবার পুতুল কিনতাম। তারই খোঁজ নিচ্ছিলাম।'

'তোমার যেমন –' ইতি হাসল। 'দশ বছরে কত কী বদলে গেল আর তুমি পুতুলওয়ালা খুঁজে বেড়াচ্ছ! এখনও পুতুল খেলার শখ নাকি!'

'সে তো কবেই ঘুচে গেছে।'

'তবে?'

'তাই তো বলছিলাম – ' শৈল তার বুক হালকা করতে চাইছিল। 'বিয়ের বছর কয়েক আগেই তো পুতুলের নেশা কেটে গেছে। কিন্তু কি জানিস, মেলার সময় হলেই ঘরে থাকতে পারতাম না। কিসের এক নেশায় রোজ চলে যেতাম। দরকার না থাকলেও পুতুল কিনতাম।'

'তোমার বিয়ে কত বছরে হয়েছে?'

'সে আর বলিস না, পনেরয় পা দিতে না দিতেই বিয়ে হয়ে গেল।' শৈল দীর্ঘশ্বাস টানল।

'ও।' ইতি চুপ করল।

শৈল আবার সুধীরকে দেখতে পেল। তখন কত ওর বয়স হবে? কত হতে পারে শৈল কখনো জিজ্ঞেস করেনি। তবে মনে হয় সতের কী আঠার। বড় বড় সুন্দর দুটো চোখ। সুধীর কথা খুব কম বলত। শুধু তাকিয়ে থাকত। চোখেই সে কথা বলত। কী বলত তাও শৈল জানে না, কিন্তু ভীষণ ভাল লাগত ওই তাকানটুকু।

'তুমি স্কুলে পড়?' শৈল শুনতে পাচ্ছে। সুধীর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

ঘাড় কাত করে শৈল জবাব দিয়েছে পড়ে। আনমনা হয়ে গিয়েছিল সুধীর। 'আমার ভীষণ পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা খুব গরিব। পড়তে পারিনি।'

সুধীরের সংগে সেই শেষ দেখা।

কী করে একটা তাড়াহুড়োয় শৈলর বিয়ে হয়ে গেল। এখন ভাবতে অবাক লাগে। বিয়ের পর দশটা বছর একটা ঘোরের মধ্যে দিয়েই কাটল। এই সময়ের মধ্যে মালতীপুরেই আসা হয়নি। মালতীপুরের মেলার কথা কীভাবে যেন মনের মধ্যে গুটিয়ে ছিল।

সেই গুটনো স্মৃতি যখন খুলল তখন মনটা ভারী হয়ে গেল। অবসন্ন। সবকিছু বদলে গেছে। শুধু থেকে গেছে একটা টান। অথচ সে টানের কোনো লাগাম নেই। ওরা বাড়ির কাছে এসে পড়ল।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শৈলর মনে হল এতটা সময় সে যেন কী একটা পেছনে রেখে চলে এল। □

ছবি : অরুণ চট্টোপাধ্যায়


সব জায়গায়, সবখানে, যেখানেই বিমানে উড়ে যাই
আমার তো
মার্ভেল
চাই-ই চাই!
— গীতা নারায়ণ
এয়ার হোস্টেস
Godrej Marvel
ELLOUS PERFUME
মার্ভেল-ভারতের বিশেষ আন্তর্জাতিক কোয়ালিটির সাবান
একটি গোদরেজ উৎপাদন



আকিনোর এখন বড় দুঃসময়

ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট কোরাজন আকিনোর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। দু বছর আগে যে উদ্দাম জনসমর্থনকে পুঁজি করে তিনি দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন; তার অনেকটাই এখন তাঁর হাতছাড়া। লৌহমানব ফার্দিনান্দ মার্কোসের পতনের পর শ্রীমতী আকিনো যখন দেশ শাসনের দায়িত্ব পান, তখন তাঁর সমকক্ষ জনপ্রিয় নেতা গোটা এশিয়ায় আর কেউ ছিলেন না। অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান ও পর্বতপ্রমাণ জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে তিনি দেশ শাসনের কঠিন শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

মার্কোস যুগের অবসানে গোটা ফিলিপিন্সই সেদিন আনন্দে ও আবেগে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। জনতা সেদিন তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আকিনোকে সম্বোধন করেছিলেন 'কোরি কোরি' বলে।

সেই আবেগ আজ আর অবশিষ্ট নেই। আবেগ রূপান্তরিত হয়েছে যুক্তিতে। জনতার বিশাল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি আকিনো। পারেননি দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে। তবে চেষ্টার ত্রুটি করেননি তিনি। দিনরাত পরিশ্রম করছেন যাতে জনগণের কল্যাণে তিনি উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

দু বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীমতী আকিনো যখন ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন সারা দেশে ওই পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা হয় 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলে। বিশ্বের সব দেশেই স্বাধীনতা উত্তরপর্বে যিনি শাসনভার গ্রহণ করেন, তিনি সব মানুষকে খুশি করতে পারেন না। সেটা সম্ভবও নয়। এতে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের সুবিধা হয়। সমালোচনা বাড়ে, বাড়ে হতাশা জনমনে।

ফিলিপিন্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস বিদেশের মাটিতে বসে এখনও আকিনো-বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বদেশের মার্কোস-পন্থীদের তিনি মদত দিচ্ছেন দেশের আইনশৃঙ্খলা যাতে ভেঙে পড়ে সেরকম কাজ করতে। চলছে ষড়যন্ত্র,



মার্কোস

অন্তর্ঘাত। বাড়ছে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের সন্ত্রাস ও হত্যা।

মার্কোস বলেছেন, ম্যানিলায় তিনি আবার ফিরে যাবেন। তিনি বিশ্বাস করেন, জনগণ এখনও তাঁকে ভালবাসেন। মার্কোস তাঁর জনবল ও অর্থবল দিয়ে আকিনোর জীবন যে অতিষ্ঠ করে তুলবেন তা বলাই বাহুল্য। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে এখনও মার্কোস-অনুগামীরা বহাল রয়েছেন। তাঁরাই অন্তর্ঘাত চালিয়ে আকিনো-প্রশাসনের ভিতকে নড়বড়ে করে দিচ্ছেন।

প্রশাসক হিসেবে আকিনো সফল হতে পারেননি ঠিকই, তবে তিনি জনপ্রিয়তার বিচারে এখনও ফিলিপিন্সের অদ্বিতীয় নেত্রী। রাজনীতিতে আসা বা দেশশাসনের মত গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া – এ ধরনের কোন বাসনাই তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁর রাজনীতিক স্বামী বেনিগনো আকিনোর যথার্থ সহধর্মিণী। মার্কোসের ষড়যন্ত্রে স্বামী খুন হবার পর জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই শ্রীমতী আকিনো মার্কোস-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ান। হাতে তুলে নেন মাইক্রোফোন, কণ্ঠে তোলেন জ্বালাময়ী শ্লোগান।

আকিনোকে সবচেয়ে বিব্রত করছে দেশের কম্যুনিস্ট গেরিলাদের সন্ত্রাস। নিউ পিপলস আর্মি নামে পরিচিত এই সন্ত্রাসবাদীরা সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে। খুন করছে নিরীহ ফিলিপিনোদের।

কম্যুনিস্ট গেরিলারা ফিলিপিন্সে অবস্থিত মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালাবার হুমকি দিয়েছে। গত অক্টোবরে ওই বিমান ঘাঁটিতে তিন মার্কিনিকে গেরিলারা গুলি করে হত্যা করে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনে আকিনো ওই বিমান ঘাঁটিতে জোরদার পাহারার ব্যবস্থা করেছেন।

গেরিলারা সরকারি সম্পত্তি এবং সক্রিয় আকিনো-পন্থীদের ওপরও আঘাত হানছে। এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারি বাহিনীকে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। এই লড়াই চালাতে গিয়ে আকিনো নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

মার্কোস তো এটাই চাইছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ধুলায় লুটিয়ে, ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে আকিনোকে অযোগ্য প্রমাণ করে মার্কোস পুনরায় ক্ষমতায় ফিরতে চান। সে সুযোগ তিনি পাবেন কিনা, তা বলা মুশকিল। তবে ফিলিপিন্সের যুবসমাজ প্রেসিডেন্ট আকিনোর বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত। প্রস্তুত পরিবর্তন-কামী সেনাবাহিনীও। তাঁরা মার্কোস-অনুগামীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর।

এশিয়ার একমাত্র মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীমতী কোরাজন আকিনো গত ২৫ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনে ছুটি কাটাতে পারেননি। দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রতিদিন ১৮ ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছে। দেশের সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞও চালিয়ে যেতে চান সমানভাবে। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানে তিনি দ্রুত কিছু ব্যবস্থা নিতে চান। দেশের অর্থনীতিতে যে ক্ষত মার্কোস সৃষ্টি করে গেছেন, তা সারিয়ে তুলতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। আকিনো চাইছেন, দেশের যুব সমাজকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে যুক্ত করাতে। কারণ এই যুবারাই তাঁর রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস। □

মিহির কর্মকার

ওয়াল হ্যাঙিং



ওয়েলকাম

এটি তৈরি করতে লাগবে নেট – আধ মিটার, অর্ধচন্দ্র আকারের (ব্লাউজ কিংবা ঘাঘরায় যে কাচ বসানো হয়) কাচ ২৪টি, চৌকো রেনবো – ১২টা, চোখের আকারের রেনবো ৩টি, লাল পাথর – ১৫টা, গোল কাচ – ৩টি, পাকীজা পুঁতি – ৫টি, বড় রেনবো পুঁতি – ৫টি, মাঝারি লাল পুঁতি – ৫টি, প্রজাপতি – ১টি ও 'WELCOME' লেখাটি এবং মোটা তারের ফ্রেম ও ফেভিকল।

প্রথমে নেটটা পরিষ্কারভাবে পেতে নিন। এবার তারের ফ্রেমটা নেটের ওপর রেখে উল্টে নিন ও চারধার থেকে নেটটা গুটিয়ে এনে মাঝখানে জড়ো করুন। যেন বেশ টানটান হয়। এবার মাঝখানটা সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলুন। বাঁধা হয়ে গেলে বাকি নেটটা কাঁচি দিয়ে কেটে নিন। এরপর যে অল্প নেট রয়ে গেল সেটা জড়িয়ে নিয়ে ছুঁচ দিয়ে সেলাই করে নিন। এবার জিনিসটি সোজা করুন। সেলাইয়ের জায়গাটায় প্রজাপতিটা ফেভিকল দিয়ে বসিয়ে দিন। এর নিচে 'WELCOME' লেখাটা বসাবেন। এখন ছবিতে যেমন আছে কাচগুলো সেইভাবে ফেভিকল দিয়ে বসান। চৌকো রেনবো পুঁতিগুলো সাজিয়ে বসিয়ে দেবেন এবং সব চৌকো পুঁতির মাঝখানে লাল পাথর দিয়ে দেবেন। এরপর একটা লাল পুঁতি, তারপর রেনবো, তারপর ২টি পাকীজা, আবার রেনবো ও লাল পুঁতি সুতোতে গাঁথুন। ওপর দিকের নেটে ছুঁচ দিয়ে গেঁথে বেঁধে দিন। এটি দিয়েই জিনিসটি ঝোলাতে পারবেন। তলাতেও সেইভাবে আছে। ওইভাবে পুঁতি ও কাচ গেঁথে নিয়ে নেটের সংগে বেঁধে দিন।

সিটিজেন ঘড়ি

এটি তৈরি করতে প্রয়োজন পুরনো ১টি রেকর্ড, বাতিল ঘড়ির ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা এবং কাঁটা ২টি, পাকীজা পুঁতি ২টি, রেনবো পুঁতি ২টি, মাঝারি লাল পুঁতি ৩টি, ১২টি লাল পাথর, ৮টি ত্রিকোণ নকশা এবং 'CITIZEN' ও 'QUARtZ' লেখা দুটি। এগুলো আটকানোর জন্য চাই ডেনড্রাইট।

প্রথমে মাঝারি একটি রেকর্ড পরিষ্কার করে নিন। তারপর যেখানে শিল্পীর নাম থাকে সেখানে কালো সোয়েড পেপারটা ভালভাবে এঁটে দিন। এবার সংখ্যাগুলো বসাবার আগে দেখে নিন ঠিক সমান দূরত্বে সাজানো হয়েছে কি না। তারপর ডেনড্রাইট দিয়ে এঁটে দিন। এরপর একটি করে লাল পাথর ওই সংখ্যাগুলির মাঝে মাঝে বসিয়ে দিন। এবার ৮টি নকশার মধ্যে প্রথমে ৪টি নকশা এমনভাবে বসাবেন যেন ১২, ৬, ৯, ৩ সংখ্যার ঠিক মাঝখানে হয়। তারপর বাকি ৪টি নকশা গায়ে গায়ে পরপর সাজিয়ে বসাবেন ছবিতে যেমন আছে। এবার ১২ সংখ্যার তলায় 'Quartz' এবং ৬ সংখ্যার উপরে 'CITIZEN' লেখা দুটি বসিয়ে দিন। সোয়েড পেপারের মাঝখানে ফুটো করতে হবে। একটি লাল পুঁতি লাল সুতোয় গেঁথে তারপর ঘড়ির কাঁটা দুটি গাঁথতে হবে। এবার সোয়েড পেপারের ফুটোর মধ্যে সুতোর মুখ দুটো গলিয়ে পেছন দিকে সুতোর মুখ দুটি ভাল করে পাক দিয়ে ছোট তারের রিঙটা পরিয়ে দিন যাতে খুলে না যায়। এখন ১২ সংখ্যাটির ওপরে রেকর্ডে তার অথবা ছুঁচ পুড়িয়ে ফুটো করে নিতে হবে। তারপর প্রথমে একটি লাল পুঁতি তারপর রেনবো পুঁতি তারপর ২টি পাকীজা আবার রেনবো পুঁতি এবং লাল পুঁথি সুতোতে গাঁথুন। গাঁথা হলে সুতোর দুটো মুখ দুটো ফুটোতে গলিয়ে বেঁধে দিন। এবার মানানসই জায়গায় ঘড়িটি ঝুলিয়ে দেখুন ঘরের চেহারা কেমন বদলে যায়!



প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেনাকাটা

কীভাবে কেনাকাটা করবেন



কেনাকাটাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই ক্রেতাকে অজস্র ঝক্কি-ঝামেলার মুখে পড়তে হয়। কেউ ইলেকট্রনিক্স জিনিস কিনে ঠকেন, কেউ ফ্রিজ-টিভি নিয়ে নাজেহাল হন, কেউ মুদিখানার মাল ও কাঁচাবাজার করে বাড়িতে এসে রুদ্ররোষে পড়েন।

কেনাকাটা পঞ্চাশ-ষাট ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রেতার মনোবাসনা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। কারণ যিনি তাঁর ব্যক্তিগত বা সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য কোনো কিছু কেনেন, তিনি সেই জিনিস দরদস্তুর করে এবং দেখেশুনে কেনারই চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন ওঠা হয়তো স্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন কেনা জিনিসটা খারাপ মানের হয়। ক্রেতার পরখের চোখ বা বিচার বুদ্ধিতেও তো অনেক সময় ফাঁক থেকে যায়। এক্ষেত্রে সেই ক্রেতার করণীয় কী থাকতে পারে? তিনি কি ওই খারাপ জিনিস পালটে দোকান থেকে ভাল জিনিস পাবার দাবি করতে পারেন বা তাঁর পুরো টাকাই ফেরত চাইতে পারেন? ধরুন, আপনি ফুটপাথের দোকান থেকে বাহারি ডিজাইনের অল্প হিলের একজোড়া চটি কিনলেন। ফুটপাথের দোকানে দামও সস্তা আর দোকানিদের ব্যবহারটাও ভাল। কিন্তু কয়েকদিন ব্যবহারের পরই চটির হিল গেল ফেটে। এখন কী করবেন আপনি? সাধারণত কলকাতা ও মফঃস্বল শহরের ফুটপাথে যে দোকানিরা বসেন তাঁদের জিনিসপত্রের সেরকম কোনো গ্যারান্টি থাকে না। বিক্রির সময় নিজেদের জিনিস সম্পর্কে এঁরা গালভরা কথা বলেন, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক হয় না। আপনি যদি হিল ফাটা চটিটা দোকানিকে ফেরত দিতে চান, তিনি হয়তো স্বীকারই করবেন না তাঁর দোকান থেকে ওটা বিক্রি হয়েছে। আবার যদিওবা স্বীকার করেন, আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন আপনি যথেচ্ছভাবে চটি জোড়া ব্যবহার করে হিল ফাটিয়ে নিয়ে এসেছেন। দোকানি যদি আপনার পরিচিত হন, তবে খানিকটা বাঁচোয়া। কিন্তু সবার তো আর পরিচিত দোকানি থাকে না। এক্ষেত্রে একটাই করণীয়, 'স্ট্রিট হকার্স ইউনিয়ন'-এর কাছে অভিযোগ জানান। এই ইউনিয়নের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা : ১১৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট। এখানে গিয়ে আপনার কেনা জিনিসের বিবরণ নথিভুক্ত করুন এবং যাঁর কাছ থেকে ওই জিনিস কিনেছেন, তাঁর নাম ও লাইসেন্স নম্বর সঙ্গে দিয়ে দিন। এতে কাজ হবার সম্ভাবনা অনেকটাই রয়েছে। তবে আপনি টাকা ফেরত পাবেন না। বদলে ভাল জিনিস পাবেন।

ফুটপাথে বিক্রি হওয়া কোনো জিনিসেরই কোনো গ্যারান্টি নেই। যা আপনি বড় কোনো দোকান থেকে কিনলে পেতে পারেন। তবে বড় দোকান থেকে জিনিস কিনেও অনেকে ভোগেন। বড় দোকানের জিনিস খারাপ হলে দোকানি কি আপনাকে পয়সা ফেরত দিতে বাধ্য? হ্যাঁ দোকানি আপনাকে পয়সা ফেরত দিতে বাধ্য। 'সেল অফ গুডস অ্যাক্ট, ১৯৩০' ধারা অনুযায়ী আপনি যখনই লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো দোকান থেকে কিছু কিনবেন, দোকানি আপনার কাছে সেই জিনিসের গুণাগুণ সম্পর্কে একশোভাগ দায়বদ্ধ। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্যাশমেমোতে লেখা, জিনিসের দাম ফেরত দেওয়া হবে না। দোকানি আপনাকে যে গ্যারান্টি কার্ডটা দিয়েছিলেন তাতেই পরিষ্কার লেখা আছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আপনার অভিযোগ গ্রাহ্য করা হবে। এই সময় পেরিয়ে যাবার পর আপনি যদি কোনো অভিযোগ নিয়ে যান, দোকানের দরজা থেকেই আপনাকে ফিরে আসতে হবে।

ক্রেতাদের নানান অভাব-অভিযোগ নিয়ে কলকাতা ও শহরতলির ছোট বড় কয়েকজন বিক্রেতার কাছে এই প্রতিবেদক গিয়েছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই স্বীকার করলেন, ফ্রিজ-টিভি বা এ ধরনের জিনিস কিনে কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই নানান অভিযোগ নিয়ে আসেন এবং এঁরা চেষ্টাও করেন ক্রেতাদের অভিযোগের সুরাহা করতে। এ প্রসঙ্গে কলকাতার অন্যতম অগ্রণী এক বিক্রেতা সংস্থার স্বত্বাধিকারী জানালেন,'আমাদের দোকান থেকে যাঁরাই কোনো কিছু কেনেন সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিযোগ এলে যে কোম্পানির তৈরি ওই জিনিস তাঁদের জানিয়ে দিই। তা যে কোম্পানিই হোক না কেন তাঁদের তৈরি জিনিসে কারিগরি দোষত্রুটি থেকে থাকলে তা সারিয়ে দিতে তাঁরা বাধ্য। তবে ফ্রিজ বা টিভি বাড়ি নিয়ে যেতে গিয়ে যদি ফেটে যায় বা এঘর ওঘর করতে গিয়ে চোট লাগে,

আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। একবার আমাদের শোরুম থেকে কোনো জিনিস বাইরে বেরিয়ে গেলে সেই জিনিসের কারিগরি ত্রুটি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নেই। এ ব্যাপারে ডিলাররা সত্যিই 'হেল্পলেস'। তিনি আরও বললেন, 'আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের পরামর্শ দিয়ে বলি আপনারা নিজেরাই কোম্পানিকে সরাসরি চিঠি লিখুন। গ্যারান্টি পিরিয়ডের মধ্যে ক্রেতাদের অভিযোগ কোম্পানি শুনতে বাধ্য।'

ধরুন কোনো দোকানি আপনাকে একটা গ্রাইন্ডার কাম ফুড মিক্সার দিয়ে বললেন, দিদি এটা নিয়ে যান, ভাল জিনিস, খুব কাজ দেবে। ইডলি-ধোসা বানাতে পারবেন। আপনিও দোকানির কথা বিশ্বাস করে দোকানদারের দেওয়া এক বোতল ঠান্ডা পানীয় খেয়ে বাড়ি ফিরলেন গ্রাইন্ডারটা নিয়ে। ভাবলেন, আজ বিকেলের টিফিনে গরম গরম ইডলি ধোসা পরিবেশন করে ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে অবাক করে দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা আর হয়ে উঠল না। গ্রাইন্ডার চাল গুঁড়ো করতেই পারল না। এ অবস্থায় আপনি কি ওই দোকানে গ্রাইন্ডারটা ফেরত দিয়ে টাকা দাবি করতে পারেন? হ্যাঁ পারেন। কারণ বিক্রির সময় দোকানি আপনাকে বলেছিলেন, ওটা ভাল জিনিস এবং কাজেরও। মিথ্যে কথা বলে দোকানি আপনাকে ঠকিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি আপনার সঙ্গে 'সেল কন্ট্রাক্ট' ভঙ্গ করেছেন। 'সেল কন্ট্রাক্টের' অন্যতম প্রধান বিষয়টি হল, খারাপ জিনিস ভাল বলে কখনোই কোনো দোকানি বিক্রি করতে পারবেন না। আপনি ওই দোকানির কাছ থেকে পুরো টাকাটাই দাবি করতে পারেন।

আপনার বিয়ের বেনারসী শাড়িটা লন্ড্রীতে দিয়েছিলেন ধোবার জন্য। কিন্তু কপাল মন্দ। অত সাধের দামি শাড়িটার খানিকটা ইস্তিরির সময় পুড়ে গেল। কী করবেন আপনি? দোকানি আপনাকে শাড়ি ধোয়া ও ইস্তিরির মোট খরচের দশগুণ অথবা শাড়ির অর্ধেক দাম দিতে চাইলেন। এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে যেটা কম সেটাই আপনি পাবেন। আপনাকে দেওয়া লন্ড্রীর ক্যাশমেমোতে তো ওই কথাই পরিষ্কার করে লেখা আছে।



ক্যাশমেমোতে লাল বর্ডার দিয়ে লেখা লন্ড্রীর শর্তাবলী পড়ে দেখার পর আপনার চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম। আপনি দোকানির দেওয়া কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবেন কি? না, ফিরবেন না। আপনি বেনারসীর পুরো দাম ওঁর কাছে দাবি করুন।

ক্যাশমেমোতে 'টাকা ফেরত দেওয়া হইবে না', 'অর্ধেক দাম ফেরত পাইবেন' ইত্যাদি যেসব শর্তাবলী লিপিবদ্ধ থাকে আদালতের আঙিনায় সেগুলির কোনরকম আইনানুগ স্বীকৃতি নেই। যেহেতু এসব শর্তাবলী ক্রেতার 'বারগেইনিং'-এর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রয়োজন হলে আপনি দোকানির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারেন। আদালতে আপনারই জয় হবে।

কোনো জিনিস কেনার পর ওই জিনিস সম্পর্কে দু-একদিন পর দোকানে অভিযোগ জানাতে এসেছেন। আপনি জানেন অভিযোগগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দোকানি আপনার কোনো কথাই শুনলেন না। আর আপনিও এ নিয়ে সময় নষ্ট করে তর্কাতর্কি করতে চান না। কেনা জিনিসটা সম্পর্কে আপনার যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলি খাতায় বা নোটবইতে লিখে রাখুন যাতে কোন কিছু ভুলে না যান বা সময়ের ব্যবধানে অভিযোগের মধ্যে অসংগতি না দেখা



যায়। দোকানির সংগে যদি সামনাসামনি দেখা করেন তবে কখন, কোনদিন এবং তাঁর সংগে কী কথা হয়েছে লিখে রাখুন। দোকানির সংগে ভদ্রভাবে কথা বলবেন, কখনই মাথা গরম করবেন না। দোকানির সংগে টেলিফোনে কথা বললেও কখন এবং কী কথা হয়েছে লিখে রাখবেন। দেশের প্রতিটি রাজ্যের জেলায় জেলায় ক্রেতাদের অভাব অভিযোগের সুরাহা করতে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি জেলায় জেলায় 'কনজিউমার্স ডিসপিউটস রিডরেসাল ফোরাম'(সি ডি আর এফ)গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন, আর এজন্য প্রয়োজনীয় আইনও পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেছে। আপনি যে এলাকায় থাকেন সেখানে যদি এ ধরনের কোনো সংস্থা তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে চলে যান সেখানে। সি ডি আর এফ আপনার অভিযোগ নিয়ে উপযুক্ত তদন্ত করবেন। সি ডি আর এফ-এর সংগে যোগাযোগ ছাড়াও আপনি স্থানীয় ক্রেতা সমিতির সংগে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি আপনার অভিযোগগুলির ওপর ভিত্তি করে দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় চিঠি দিতে পারেন। তবুও যদি কিছু না হয় আপনাকে ওই দোকানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে আইনজীবীর পরামর্শ অবশ্যই নেবেন।

১৯৮৪-এর কনজিউমার্স অ্যাক্টের বেশ কয়েকটি ধারার পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের আগে কোনো ক্রেতাকে বিক্রেতার বিরুদ্ধে একাকী আইনী লড়াই লড়তে হত। ধারাগুলির পরিবর্তনের পর ক্রেতাদের সুবিধে এখন অনেক বেড়ে গেছে। আইনী ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারে আপনি মনস্থির করলে সোজা চলে যান এম আর টি পি কমিশনারের কাছে। কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানানোর পর তাঁর দপ্তর থেকেই আইন-আদালত করা হয়। ওঁরাই কেস লড়েন। ১৯৮৬-র

কনজিউমার্স অ্যাক্টে বলা হয়েছে : ব্যাংকিং, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি আরও কিছু ব্যাপারে আপনার কোনো অভিযোগ থাকলে আপনি সরকারি বিভাগের বিরুদ্ধে এম আর টি পি কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন বা কমিশনারের মূল্যবান পরামর্শও নিতে পারেন।

সঠিক দামে সঠিক কেনাকাটা করা সত্যিসত্যিই ক্রেতার এক বিশেষ গুণ। (১) কোনো জিনিস কেনার আগে দোকানির কাছ থেকে বিক্রির বিভিন্ন শর্তাবলী ভালভাবে জেনে নিন। (২) আপনি দোকানির আদর-আপ্যায়নে এবং কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়ে যে জিনিস সম্পর্কে কিছুই জানেন না তা কখনই কিনতে যাবেন না। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স জিনিস বা ফ্রিজ টি ভি। এক্ষেত্রে আত্মীয় বা নিকট বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ নিন। (৩) পরিচিত দোকানে যাবার চেষ্টা করুন। আপনার কেনার পর কোনো অভিযোগ চেনাজানা দোকানি যেভাবে ধৈর্য ধরে শুনবেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করবেন অচেনা দোকানি তা কখনই করবেন না। (৪) শাড়ি বা জামাকাপড়ের রঙ সম্পর্কে দোকানির কাছ থেকে যদি কোনও গ্যারান্টি না পান কিনতে যাবেন না। যদিও বা কেনেন রঙ উঠলে মন খারাপ বা দোকানিকে শাপ-শাপান্ত করবেন না। (৫) কোনো দোকানি আপনাকে খারাপ জিনিস গছিয়ে দিলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা গড়ে তুলুন। আপনি নতুন করে ঝামেলায় পড়তে চান না বলে যদি চুপচাপ থেকে যান তবে পরোক্ষে ওই দোকানিকেই মদত দিয়ে ফেলবেন।

সুমন গুপ্ত

ভ্রম সংশোধন

অনবধানবশত ১ এপ্রিল '৮৮ সংখ্যা সুকন্যার 'কেনাকাটা' বিভাগে 'চৈত্রের ছাড় : নানা রঙের শাড়ি' রচনাটিতে গড়িয়াহাটা 'আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় ২০ শতাংশ রিবেট দিচ্ছে... তথ্যটি ভুল। গড়িয়াহাটা আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় কখনই রিবেট দিয়ে কোনো রকম শাড়ি বিক্রি করে না। তথ্যগত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ফটো : অভিজিৎ রায়



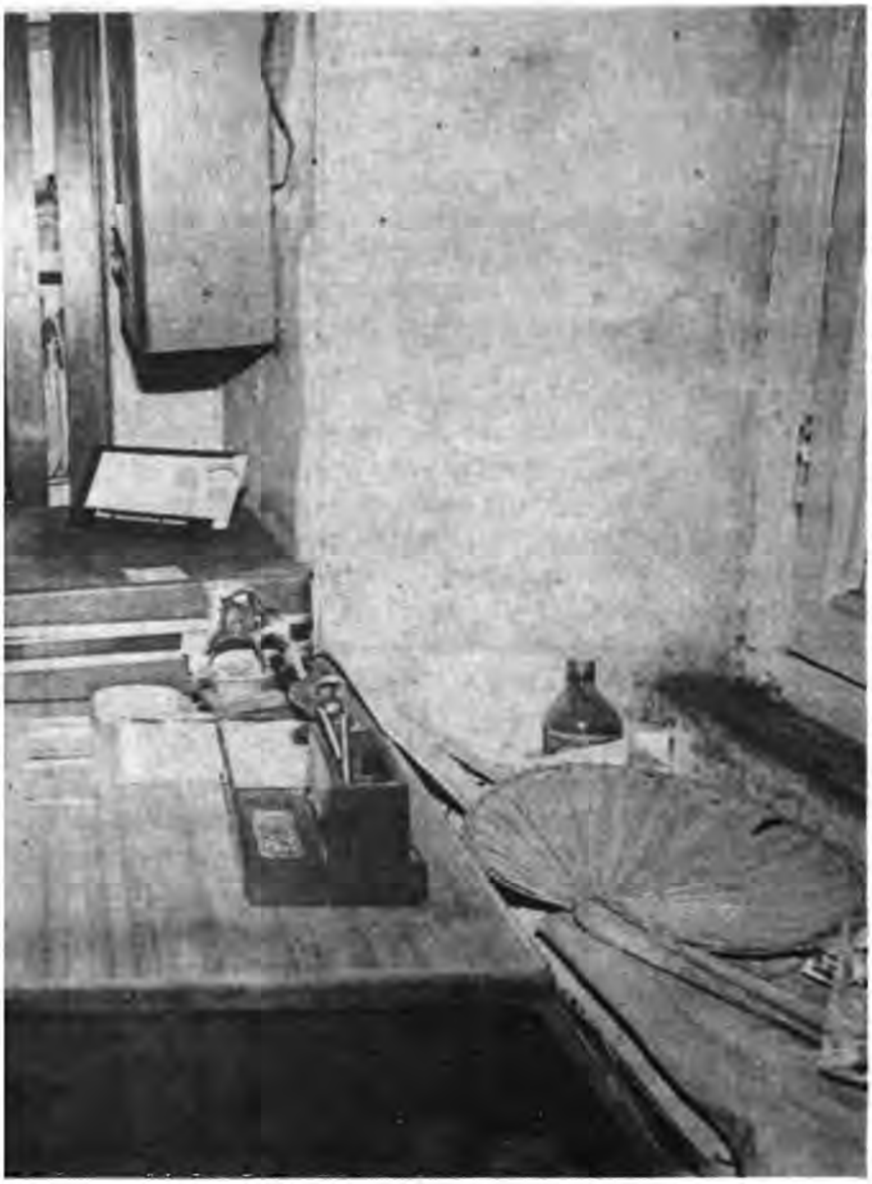
ডাক্তারের সংগে কীভাবে কথা বলবেন

আপনি কি খুব অসুস্থ? কোনো গুরুত্বর রোগ কি বাসা বেঁধেছে আপনার ভেতর। তাহলে আর অযথা দেরি না করে পরামর্শ নিন ডাক্তারের। কথায় কথায় ডাক্তারের কাছে ছোটার রোগ আমাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। বরং যারা ছোটোখাটো ব্যাপারেই ডাক্তারের দ্বারস্থ হন তাদের নিয়েই আমরা হাসি মস্করা করি। আমাদের পরিচিত একটি মেয়ে – রোগের বাসা, ডাক্তার লেগেই আছে। এই সেদিন দেখা হল তার সংগে। নাকে রুমাল গোঁজা। ঘন ঘন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ জল গড়াচ্ছে। বললাম – কি হে জ্বর সর্দি বাঁধিয়েছ। মেয়েটি বলল – সিজন চেঞ্জের সময় তো। পাশ থেকে তার এক বন্ধু ফোঁড়ন কাটল – 'শীতকালে শীত গোটা, গ্রীষ্মকালে ঘামাচি, কোন কালে ছিলিরে তুই রূপসী।' রোগ নিয়ে এ ধরনের মস্করাই চলে। আবার যারা একটু আধটু রোগেই ডাক্তারমুখী হন, তারাও যে মন খুলে সব ডাক্তারের কাছে বলতে পারেন তাও নয়। অনেকেরই অর্ধেক কথা থাকে পেটে। কী করে সমস্ত উপসর্গ ডাক্তারকে জানিয়ে রোগ নির্ণয়ে তাকে সাহায্য করা যায় সে পদ্ধতিটাই জানেন না অনেকে। কিন্ত না জানার কথা নয়।

ধরুন, আপনার বাথরুমের জলের কলটা ভেঙে গেছে। আপনি মিস্ত্রী ডাকলেন। কী জিজ্ঞেস করবেন আপনি মিস্ত্রীকে? নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন – আচ্ছা কি করে ভাঙল কলটা বলুন তো? কলটা নতুন করে লাগাতে কত নাট বল্টু লাগবে? মিস্ত্রীর মজুরী কত? কলটা লাগাতে কতক্ষণ লাগবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। যে আপনি একজন মিস্ত্রীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত কথা জেনে নিলেন সেই আপনিই কিন্তু ডাক্তারের কাছে স্পিকটি নট। আপনার দেহ যন্ত্রটি ভেঙে পড়েছে। তা মেরামতির দায়িত্ব পড়েছে ডাক্তারের ওপর। এখানে ডাক্তারের ভূমিকা কিন্তু ওই মিস্ত্রীর মতোই। সেখানে যদি আপনি আপনার অসুবিধাগুলি পরিস্কার করে না জানান তবে ডাক্তার বেচারি কি করে আপনার রোগ সারাবেন। আপনি যদি আপনার রোগের উপসর্গগুলি ডাক্তারের কাছে সঠিকভাবে উত্থাপিত করতে পারেন তবেই আপনার রোগের উপসম সম্ভব

তিল থেকে তাল

সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা ডাক্তারের সংগে আমার আলাপ হয়েছে। জনৈকা মহিলা মাঝে মাঝেই আসতেন তাঁর কাছে। কিন্তু ওই মহিলার স্তনে যে একটা ছোট্ট আবের মত হয়েছে, তা তিনি ঘুণাক্ষরে জানাননি ডাক্তারকে। হঠাৎ একদিন ওই ডাক্তারের চোখে পড়ে যায়



ফটো : [illegible]

ওই আব। চমকে যান তিনি – আরে এটা কী? মহিলার নির্লিপ্ত উত্তর – 'ও কিছু না। অনেক দিন থেকেই আছে'। কিন্তু রোগিণীর ওই আপ্তবাক্যে আশ্বস্ত হতে পারেননি ডাক্তার ভদ্রলোক। তিনি বায়োপ্সি করতে বললেন। বায়োপ্সিতে ধরা পড়ল ক্যানসার। এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটছে। গুরুত্বহীন মনে করে অনেক বড় ব্যাপারই উড়িয়ে দিচ্ছেন সাধারণ রোগীরা। কিন্তু আসলে তো আর উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ওই ছোট্ট আবই মৃত্যুর স্পন্দন তুলছে দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

ডাক্তারের সংগে কথা বলার সময় অনেকেই আড়ষ্ট বোধ করেন। সংকোচের বিহ্বলতায় অনেক কথাই তাঁরা পেটে রেখে দেন। ভাবেন – এই সামান্য ব্যাপারটার কথা আবার কি জানাব। কোনো ব্যাপারে ডাক্তারকে সরাসরি প্রশ্ন করতেও ভয় পান কেউ কেউ। অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় একটু দেখা যাক।

ধরুন আপনি ডাক্তারকে প্রশ্ন করে বসলেন – আচ্ছা থাইরয়েড, ওডেমা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আপনার প্রশ্ন শুনে ডাক্তার ভদ্রলোক হয়ত ভাবলেন – কি বোকারে বাবা। ডাক্তার হয়ত আপনাকে আগাপাস্তলা দেখে বললেন – আপনার পেপ্টিক আলসার হয়েছে। আপনি একটু প্রগলভ হয়ে বললেন – আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমার যে পেপটিক আলসার হয়েছে আপনি কি করে বুঝলেন। ডাক্তার কিন্তু আপনার এই প্রশ্নে মোটেই খুশি হবেন না। ভাববেন – আপনি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

রোগ নির্ণয়ের পর ডাক্তার লম্বা প্রেসক্রিপশন করলেন। এই ট্যাবলেটটা খাবেন তিনবার – সকাল, দুপুর, রাত। আর এটা খাবেন দুপুর আর রাতে খাবার পরে দু'চামচ করে। ডাক্তার প্রেসক্রিপশনটা আপনার হাতে ধরিয়ে দিতেই আপনি বেমক্কা হয়ত বলে বসলেন – আচ্ছা এই ওষুধগুলোর কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো। ডাক্তার আরো ক্ষেপে যাবেন একথা শুনে। মনে মনে বলবেন – আচ্ছা খুঁতখুঁতে লোক তো।

বেশ কিছুদিন গেল। আপনি হয়ত ভাবলেন দেখা যাক না আরেকজন ডাক্তারের সংগে কথা বলে। কিংবা ভাবলেন – হোমিওপ্যাথি, অথবা কবিরাজি চিকিৎসা করাবেন। আপনার ডাক্তারকে জানালেন সে কথা। শুনে তিনি ভাবলেন – কি, আমার ওপর বিশ্বাস নেই। যাক তবে যে চুলোয় খুশি।

সাধারণভাবে ডাক্তার আর রোগীর সম্পর্কটা এ ভাবেই চলে। কখনো ডাক্তারদের হম্বিতম্বি দেখে রোগী চুপ মেরে যান। কখনো বা রোগীদের ঘ্যানঘ্যানানিতে ডাক্তার বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তবে যে সব রোগী ডাক্তারের কাছে তাদের অসুবিধার কথা গুছিয়ে বলতে পারেন তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক কমে যায়। ডাক্তারদেরও সুবিধা হয়। রোগীরা অযথা ওষুধের বোঝা, এমনকি অপারেশনের হাঁপাও সামলাতে পারেন। তাই ডাক্তারদের সংগে কিভাবে কথা বলতে হবে তা জানতে হবে। কোন কথাটা কখন বলতে হবে সেটা রপ্ত করতে হবে। ডাক্তারের কাছে যাবার আগে অন্তত চারটি ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন।

চারটি ধাপ

● আপনার টেম্পারেচার নিন।

● আপনি আপনার রোগের উপসর্গগুলি টুকে নিন। পর পর সাজিয়ে নিন সেগুলিকে।

● আপনি সাধারণত কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করেন। আপনি কি হামেশাই ওষুধপত্র খান? নাকি মাঝে মাঝে।

● আপনি কোন ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দেখাতে চান। ডাক্তারের মুখোমুখি বসে রোগ নিয়ে আলোচনা করতে চান? নাকি ফোনে কথা বলতে চান।

কীভাবে ডাক্তার বাছবেন

১। প্রাথমিকভাবে একজন জেনারেল ডাক্তারই ধরুন : এমন লোক আছেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া যাঁদের মনই ওঠে না। কথায় কথায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে ছোটেন তাঁরা। কিন্তু আপনার ছোটোখাটো রোগের জন্য কাছাকাছি একজন জেনারেল ডাক্তারই তো ভাল। তিনিই হবেন আপনার পারিবারিক ডাক্তার। আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যের ভার তাঁর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যদি দেখাতেই হয় তিনিই সময়মত বলে দেবেন আপনাকে। কোন ডাক্তার দেখালে ভাল হয়, তাও বলে দেবেন তিনি।

২। আগেভাগেই ভেবে রাখুন : আমরা সাধারণত রোগে পড়লেই ডাক্তারের খোঁজ করি। তখন তড়িঘড়ি যাকে পাই তাকেই দেখাই। কারণ বাছাবাছির সময় থাকে না। তা না করে আগেভাগেই ঠিক করে রাখুন দরকার হলে কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন আপনি। তাহলে আর দরকারের সময় দিশেহারা হতে হবে না।

৩। ডাক্তারের মতিগতি আঁচ করার চেষ্টা করুন : সব ডাক্তার একরকম নন। এমন অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা কথায় কথায় অমুক টেস্ট করুন তমুক টেস্ট করুন বলে হাঁকেন। কিংবা কথায় কথায় মারাত্মক সব অ্যান্টিবায়োটিক, ট্রাঙ্কুলাইজার লিখে বসেন। তাঁদের সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকা ভাল।

৪। প্রতিষেধকের ওপর জোর দিতে হয় : সব রোগ ওষুধে সারে না। সে জন্য ডাক্তারকে আপনার নাড়ি-নক্ষত্র জানতে হবে। আপনি কি ধরনের খাদ্য খান, ব্যায়াম করেন কিনা, ধূমপান করেন কিনা, কোনো পানীয়ে আপনার আসক্তি আছে কিনা। এসব জানতে পারলে প্রতিষেধক বাতলানো সোজা। □

ডাক্তারের মুখোমুখি

● প্রথমে ডাক্তারকে আপনার রোগের সমস্ত উপসর্গ বিস্তারিত জানান। এই ধরনের রোগ আপনার পরিবারে আর কারো আছে কি না তাও জানান। আপনি কি কোন নেশায় আসক্ত। লজ্জা পাবেন না। ডাক্তারের কাছে সব বলুন। আপনি ক'প্যাকেট সিগারেট খান, মহুয়ার মিষ্টি নেশায় মাতোয়ারা থাকেন কতদিন, সব বলুন।

● কথা পেটে রাখবেন না। আপনার ঘুম হয় না। পারিবারিক অশান্তি চলছে। স্ত্রীর সংগে সম্পর্ক এত তিক্ত হয়ে উঠেছে যে সম্পর্ক এই বুঝি ভেঙে যায় আর কী? কারণ আপনার যে রোগটি হয়েছে তা যে নিছকই শারীরিক ব্যাপার তা কিন্তু নয়। শরীরের সংগে মনের যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রটি ভুলে যাবেন না। তা হলেই বিপত্তি। ঘরের কথা পরের কাছে বলতে শরম লাগবে বৈকি। কিন্তু ডাক্তারের কাছে লজ্জা পেলে চলবে না।

● ডাক্তার আপনাকে দেখেশুনে যেসব কথা বলবেন, তা ভাল করে শুনুন, পরে মিলিয়ে নেবেন। ধরুন, ডাক্তার বললেন এই ক্যাপসুলটা খেলে আপনার প্রস্রাব একটু হলদেটে হবে। পরে মিলিয়ে দেখুন তা হচ্ছে কিনা। ডাক্তার যেমনটা বললেন তেমনটা আপনার না হলে সংগে সংগে বলুন।

● ডাক্তার যখন প্রেশক্রিপশনটা হাতে ধরালেন তখনই তাঁর কাছ থেকে জেনে নিন ওইসব ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা। সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট হলে কি প্রতিষেধক নেওয়া যায় সেটাও জেনে রাখুন। এমন অনেক রোগী আছেন যাঁরা প্রেসক্রিপশন মিলিয়ে ওষুধ কেনেন। কিন্তু কয়েকটা ট্যাবলেট খাবার পরই হয়ত তিনি দেখলেন – কই অসুখ তো সারছে না। তখনই ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিংবা ডাক্তার যে ডোজ লিখে দিয়েছিলেন তা দিলেন পালটে। কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বরং সংগে সংগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতে ডাক্তার ওই ওষুধের ডোজ কমিয়ে দেওয়ার অথবা আরো হালকা কোনো ওষুধ দেওয়ার সুযোগ পান।

● কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তার পালটাবার সিদ্ধান্তও নিতে হয়। প্রথমত আপনি একজন ডাক্তারের কাছে তিন দফা দৌড়লেন। প্রতি দফাতেই গাদাগুচ্ছের ওষুধ খেলেন, কিন্তু রোগ সারার নাম নেই। সেক্ষেত্রে আপনি অন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, ডাক্তার বলে দিয়েছেন আপনার কঠিন রোগ। ধরা যাক ডায়েবেটিক বা ক্যানসার কিংবা অন্য কোনো উৎকট বিরল রোগ। সেক্ষেত্রে অন্য ডাক্তারের কাছে একটু যাচাই করে নেওয়া ভাল। তৃতীয়ত, ডাক্তার হয়ত বললেন, এ আপনার মনের রোগ কিংবা বললেন, অপারেশন করতে হবে – সেক্ষেত্রে অন্য ডাক্তারের একটু পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

● ডাক্তার যদি অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন, কি করবেন

১। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন অপারেশন ছাড়া এই রোগের আর কোনো চিকিৎসা আছে কিনা। এই মুহূর্তে অপারেশন না করলে কি ধরনের বিপদ হতে পারে?

২। এই ধরনের অপারেশনে কোনো ঝুঁকি আছে কিনা।

৩। এ ব্যাপারে অন্য কোনো সার্জেনের পরামর্শ নিতে পারেন। কারণ, একজন ডাক্তার অপারেশন করতে চাইলেও, অন্যজন হয়ত ওষুধ খাইয়েই আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারেন। এমনও দেখা গেছে, অযথাই অপারেশনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে অনেক রোগীকে।

● ডাক্তারের সংগে রোগীর একটা সখ্য থাকা চাই। কোনো ডাক্তার যদি আপনার কাছে বিশ্বস্ত মনে না হয়, তাঁর কাছে আপনি নিশ্চয় আপনার সমস্যার কথা খুলে বলতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার অন্য ডাক্তার খুঁজে নেওয়াই উচিত।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব রোগী তাদের সমস্যার কথা যত পরিষ্কার করে বলতে পারেন তাদের ভোগান্তি তত কম হয়। শুধু ওষুধ নির্ভর হয়ে বাঁচতে হয় না তাঁদের। □

পৃথা সেন

গাঁয়ের কথা

রোজ সকালের সবজি পসারিনী



বিকিকিনির ভোরে

শিবরামপুর থেকে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে চম্পা যখন বকুলতলা বাজারে এল – তখনও শীতের সূর্য উঁকি দেয়নি আকাশে। প্রায় মাইল চারেক পথ। কিছুটা মেঠো, কিছুটা পাকা। ধকল কম হয় না। তাই শীতের ভোরেও চম্পার কপালে, গালে, গলায় শিশির বিন্দুর মত ঘাম জমেছে। প্রাতঃভ্রমণ শেষে কয়েকজন এসেছেন বাজারে। বাড়ি ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে যাবেন। চম্পা ঝাঁকার ওপর থেকে ময়লা কাপড়ের আচ্ছাদন সরিয়ে দেয়। শিশির ভেজা মটর শাক, মেটে আলু, বেগুন, কড়াই শুটির স্তূপ সরিয়ে বার করে দাঁড়িপাল্লা। বাবুরা গুটি গুটি এসে দাঁড়ান চম্পার ঝাঁকার সামনে।

বছর পঁচিশ বয়সের চম্পার সুখের সংসার ছিল। কপালে সুখ সইল না। স্বামী দূরে কাজ করতে গিয়ে আর একটা বিয়ে করল। সেখানেই ঘর বাঁধল। চম্পার মাথায় যেন বাজ পড়ল। কোলের শিশুটার বয়েস মোটে তিন বছর। কি করবে – কূল কিনারা না পেয়ে, এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে কলমি আর হিঞ্চের শাক তুলে রোজ আসত বকুলতলার বাজারে। তারপর দুঃখের কয়েকটা বছর কাটিয়ে এদিক সেদিক থেকে টাকা যোগাড় করে আনাজপাতির ব্যবসা শুরু করল চম্পা। চম্পার এখন প্রতিদিন উপায় হয় কুড়ি পঁচিশ টাকা। বকুলতলা বাজারে চম্পা, বীণা, কামিনী ছাড়াও আরও প্রায় কুড়ি বাইশজন গ্রামের মহিলা নিত্য আনাজপাতি, ফুল ফল বেচতে আসে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হাঁসপুকুর থেকে গৌরী বড়িশার এক অস্থায়ী প্রভাতী বাজারে অনেকের সংগে আসে ফুল বেচতে। স্বামী দিনমজুর। রোজগারের সবটুকু নেশাতে চলে যায়। গাঁদাফুল, আমের পল্লব, থানকুনি পাতা, গিমে শাক বিনামূল্যে সংগ্রহ করে আনে গৌরী। গৌরীর চার ছেলেমেয়ে। ছেলেদের জামা কিনতে হয় না। বাজারের সামনে মুখুজ্যে বাড়ির বড় বউ শুভ্রা বউদি গৌরীর ছেলেদের জন্য নিজের ছেলের জামা দিয়ে দেন। কলকাতার প্রায় সব বাজারেই গ্রামের মহিলারা আনাজপাতির পসরা সাজিয়ে বসে। ভোরের আলো-আঁধারিতে লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং থেকে যে ট্রেনগুলো ছুটে আসে – তারাই স্টেশনে স্টেশনে উগরে দেয় শত শত মহিলা যাত্রীকে। পরনে তাদের আধময়লা শাড়ি কিংবা থান। মাথায় ঝাঁকা। প্রতিদিন এদের উপায় দশ থেকে তিরিশ টাকা। অনেকে আসে আবার বাসে। ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, শিবানীপুর থেকে।

মহিলা বিক্রেতার সংখ্যা বেশি লেক মার্কেট ও গড়িয়াহাট বাজারে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংগে ট্রেন সংযোগই এর মুখ্য কারণ। ইট কাঠ পাথরের কলকাতা শহরের বাবুদের খাদ্যরুচি

বদলে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

গ্রামে যা সহজলভ্য – সেই সব শাক সবজি আনাজপাতি নিয়ে আসে এরা। বাজারে – বৃদ্ধ কিশোর – সবার কাছেই এরা 'মাসি'। এদের ওপর ক্রেতাদের সহানুভূতি একটু বেশিই। তাই বেলা দুপুরে এরা যখন বাড়ি ফেরে তখন অবিক্রিত কিছুই থাকে না। বাড়ি

ফেরার পথে অনেকেই কিনে নেয় পড়তি কড়তি চুনো মাছ, আলু, কপি। বাড়িতে অলস মদ্যপ স্বামী, এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে তাদের মুখে তো কিছু দিতে হবে।

শহরে বাস করে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের ভয়াবহতা বোঝা সহজ নয়। বীণা, চম্পা, কামিনী, গৌরীরা যদি লাজলজ্জা ঝেড়ে ফেলে পথে না নামতো – তবে গ্রামের হাজার হাজার পরিবারকে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হতো। গাঁদা ফুল ছিঁড়ে, হিঞ্চে কলমী তুলে তবু তো এরা যাহোক ছেলেমেয়ের মুখে দুমুঠো নুন-ভাত দিতে পারছে। আর পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু অর্থ উপায়ের পথ এদের জানা আছে বলে – অপদার্থ অত্যাচারী স্বামীর কাছে



থলে ভরে সবুজ সবজিতে

এরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণও করে না। তেমন হলে এরাই বরং অলস স্বামীকে দুচার কথা শুনিয়ে দেয়।

কিন্তু শহর যে ক্রমেই থাবা বাড়াচ্ছে গ্রামের দিকে। ধান ক্ষেতে কলকারখানা হচ্ছে। পুকুরগুলো সবই ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বন জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে উঠছে। শ্যামা, মালতী, সন্ধ্যা এর পর কোথায় খুঁজবে কলমী লতার ডগা? কোন পুকুরে যাবে শালুকের কুঁড়ি আর হিঞ্চে শাক তুলতে? কোন বাগানে ঝরে পড়বে সজনে ফুল? কোন জঙ্গলে মাটির তলায় লুকিয়ে থাকবে আমআদা আর মেটে আলু?

কলকাতার বাবুরা গিয়ে শাকের বড়া আর সজনে ফুলের চচ্চড়ির স্বাদ ভুলে গিয়ে হয়তো হাপিত্যেশ করবেন কয়েক বছর পর।

যতদিন সম্ভব বীণা, চামেলীরা আসবে। ভোরের ট্রেনের বাঁশি আর বাসের ধাতব আওয়াজ ওদের ডাক দিয়ে যায় রোজ। ওরা ছুটে আসে বাজরা মাথায় নিয়ে। দেরি করলে চলবে না। বাবুদের অফিস আছে না!

মিহির মজুমদার

ফটো: [illegible] নন্দী

টেরোকোলেট (২) সোডিয়াম গ্লাইকোলেট। খাবারের সংগে চর্বিজাতীয় যা কিছু আমরা খাই, সেগুলো হজম করায় এই সল্ট দুটো। বাইল পিগমেন্ট তৈরি হয় দুটো উপাদানে – (১) বিলিরুবিন, (২) বিলিবারডিন। এই দুটো মিলেই পিত্তের রঙ হলুদ। এই দুটো জিনিস খাবারের সংগে মিশে তৃতীয় আরেকটা রঙ তৈরি করে। এর নাম স্টারকোবিলিন। এই স্টারকোবিলিন পায়খানার সংগে বেরিয়ে আসে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় পায়খানার রঙ হয় হলদে।

লিভারে সব সময় পিত্ত তৈরি হয়। কিন্তু পিত্তনালী দিয়ে যদি তা স্টমাক-এ যেতে না পারে এবং ক্রমাগত লিভারে জমতে থাকে, তবে লিভারের আকার বড় হয়ে যায়। একটা সময় লিভার আর জমে থাকা পিত্ত ধরে রাখতে পারে না। তখন ওগুলো বেরিয়ে এসে রক্তের সংগে মিশে যায়। তারপর ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। এজন্যই জন্ডিসের রোগীর রক্ত পরীক্ষায় বিলিরুবিন পাওয়া যায়।

সুকন্যা : জন্ডিস যদি লক্ষণ হয়, তবে রোগটার নাম কী?

ডাঃ মিত্র : হেপাটাইটিস। বাংলায় বলা যায় যকৃতের প্রদাহ। সাধারণত তিন ধরনের হেপাটাইটিস দেখা যায় – ইনফেকটিভ, অবস্ট্রাকটিভ এবং হিমোলিটিক। যে হেপাটাইটিস এখন সকলের চিন্তার কারণ হয়েছে তা হল, ইনফেকটিভ।

সুকন্যা : বিশেষ কোনো এক ধরনের ভাইরাসের ইনফেকশনেই কি এটা হয়

ডাঃ মিত্র : ভাইরাসেরও রকমফের আছে – 'এ' 'বি' 'নন এ নন বি'। হেপাটাইটিস 'এ'-র ইনফেকশন দূষিত জলের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের সংক্রমণ হয় রক্তের মধ্যে দিয়ে। ডাক্তার, নার্স, অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা সাধারণত এই দ্বিতীয় ধরনের হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হন। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ কিংবা শরীরের কোনো ছোটখাট ক্ষতের মধ্যে দিয়ে এই ভাইরাস রক্তের সংগে মিশে যায়।

যৌনাচারের মাধ্যমেও অনেকে এর শিকার হন। এছাড়া 'নন এ নন বি'-র ভাইরাস দুভাবেই শরীরে আসতে পারে। দূষিত জলের মাধ্যমে কিংবা রক্তের মাধ্যমে।

সুকন্যা : ভাইরাস ইনফেকশন ছাড়া আর কী কী কারণে হেপাটাইটিস হয়

ডাঃ মিত্র : পিত্তথলিতে টিউমার, পাথর কিংবা ক্যানসার হলে, পিত্তনালীর মুখে বা ভেতরে কৃমি জড়িয়ে গেলে পিত্ত বেরোতে না পারায় লিভারে তা জমে হেপাটাইটিস হতে পারে। প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থিতে টিউমার হলে পিত্তনালী ফুলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই কারণেও হেপাটাইটিস হওয়া সম্ভব। এছাড়া, অনেকে বলেন সিরোসিস অব লিভার (যকৃত শুকিয়ে যাওয়া) হলেও জন্ডিসের লক্ষণ দেখা যায়। তবে তা কিন্তু সব সময় হয় না।

সুকন্যা : ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে কীভাবে বাঁচা যায়?

ডাঃ মিত্র : যেহেতু দূষিত জলের মাধ্যমেই ভাইরাস সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছড়ায়, সেহেতু জল ফুটিয়ে খাওয়া দরকার। দশ থেকে পনের মিনিট ফোটাতে হবে। ফোটানো জল খেতে বিস্বাদ লাগে। তাই ওই জলে সামান্য গ্লুকোজ আর নুন ফেলে খাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, বাজারের খোলা খাবার খাওয়া এবং পথচলতি যেখানে সেখানে জল খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

সুকন্যা : সাধারণত যে হেপাটাইটিস হয়, তার সংগে অন্তঃসত্ত্বাকালীন হেপাটাইটিসের তফাত কী?

ডাঃ মিত্র : প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে 'বি' কিংবা 'নন এ নন বি' টাইপের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই সময় শিশুর নাড়ি মায়ের সংগে যুক্ত থাকে। ফলে দুজনেরই প্রাণসংশয় হতে পারে।

সুকন্যা : এর থেকে বাঁচার উপায় কী?

ডাঃ মিত্র : ওই আগে যা বললাম। জল ফুটিয়ে খাওয়া, খোলা খাবার না খাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া প্রেগন্যান্সি টাইমে যে নানারকম ইঞ্জেকশন নেওয়া হয়, তার সিরিঞ্জগুলো ভালভাবে স্টেরিলাইজ করা দরকার। সম্ভব হলে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ (যেগুলো একবারই মাত্র ব্যবহার করা যায়) ব্যবহার করা ভাল।

সুকন্যা : হেপাটাইটিসের প্রভাব শরীরে কতদিন পর্যন্ত থাকে

ডাঃ মিত্র : হেপাটাইটিস 'এ'-র ক্ষেত্রে দেড়মাস থেকে তিনমাস পর্যন্ত। আর অন্য দুটোর প্রায় ছ মাস পর্যন্ত।

সুকন্যা : রোগীর পথ্য কেমন হওয়া দরকার

ডাঃ মিত্র : প্রোটিন আর ফ্যাট একেবারে খাওয়া উচিত নয়। তরকারি একেবারে সেদ্ধ অবস্থায় খেতে হবে। তেল ঘি একদম নয়। তবে মাখন তোলা দুধ, (যেমন মাদার ডেয়ারির দুধ) খাওয়া চলতে পারে। এছাড়া কার্বোহাইড্রেট জাতীয় জিনিস বেশি খাওয়া উচিত। স্টার্চযুক্ত খাদ্য, যেমন – ভাত, আলু এগুলো বেশি সেদ্ধ করে খাওয়া উচিত। ফলের মধ্যে আখ, কমলালেবু, মৌসম্বির রস খাওয়া ভাল। এসব ছাড়া বেশিমাত্রায় গ্লুকোজ খাওয়া দরকার। প্রতিদিন অন্তত দুশ গ্রাম। আমিষের চেয়ে নিরামিষ খাওয়াটাই এসময় ভাল। কারণ আমিষ খেলে লিভারে প্রেশার পড়ে। □

সাক্ষাৎকার : সাধনা শাহ

পছন্দের শাড়িতে নন্দিনী













'গরমের দিনে চুড়িদারের জুড়ি নেই। ঘরে-বাইরে এত আরাম আর কোন পোশাকে বলুন? তবে মুশকিল হল, সব জায়গায় তো চুড়িদার চলে না। বিশেষ করে সামাজিক অনুষ্ঠানে। একেবারেই না। ওসব জায়গায় একমাত্র চলে শাড়ি। তবে শাড়ির ব্যাপারে আমি ভীষণ সিলেকটিভ। 'ডালিয়া'-র কিছু এক্সক্লুসিভ শাড়ি আমার দারুণ পছন্দ। বিয়ের সময় ওখান থেকেই বেশিরভাগ শাড়ি কিনেছি।'



আভাসে, কমলা-কালো ডুরেতে কী উজ্জ্বল! দেখেই কমলা রঙের রোদ্দুর মনে পড়ে। কোনো পুজো-পার্বণের দিনে ভোরবেলায় কিংবা শ্রাদ্ধবাসরে যেতে নন্দিনীর পছন্দ এই শাড়িটি। সংগে হালকা সোনার গয়না।

গরমের দিনে ভর দুপুরের নেমন্তন্ন ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু সামাজিকতা রাখতে যেতেই হয় লোড শেডিং এর জন্য অনেক নেমন্তন্নই এখন দুপুরে। হালকা রঙের চান্দেরি বা ওই জাতীয় শাড়ি এসব অনুষ্ঠানে বেশ মানায় তবে নন্দিনীর সবচেয়ে প্রিয় ঘি-রঙা মসলিনটি। পালকের মত হালকা, নরম রঙে চোখ জুড়নো স্নিগ্ধতা। দীর্ঘ আঁচলে নানারঙের কারুকাজ। কিন্তু শাড়ির অন্য কোথাও রঙের ছিটেফোঁটা নেই। এই শাড়ির সংগে মুক্তো, রুপো কিংবা মিনে করা সোনার গয়না পরতে ভালবাসেন নন্দিনী।

সন্ধে বা রাতের পার্টিতে হালকা রঙ চলে না। কিন্তু রঙ গাঢ় হলেও গরমের দিনে শাড়িটা হালকা হওয়া চাই। জড়ির কাজ করা বাদামি রঙের ঢাকাই জামদানি আর গাঢ় তুঁত রঙের কাতান সিল্ক, দুটো শাড়িই দেখতে জমকালো, কিন্তু নরম এবং হালকা হওয়ায় পরতে খুব আরাম। জমকালো শাড়ির সংগে ভারী গয়নাই মানায়। কিন্তু রাত-বিরেতে সোনা রুপোর গয়না পরতে সাহস হয় না। নকল গয়নার তো অভাব নেই বাজারে। মানানসই নিত্য নতুন গয়নায় মোহিনী হয়ে ওঠেন নন্দিনী।

এই সিরিজের ছবিগুলো তুলেছেন অর্ধেন্দু রায়

নন্দিনীর পছন্দের শাড়িগুলো সত্যিই নজর কাড়ে। সরু কমলা পাড়ের আড়ে-ডুরের সাদা টাঙাইলটি দেখুন। খুব দামি কিছু নয়। কিন্তু কমলা সুতোর ওপর অল্প জরির

'ডালিয়া'-র শাড়ি

উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় এই দোকানে 40 টাকা থেকে 4000 টাকা পর্যন্ত শাড়ির সম্ভার রয়েছে। এঁরা নিজস্ব ডিজাইন এবং ফরমায়েশি রঙে তাঁতিদের দিয়ে শাড়ি বোনান। ফলে প্রত্যেকটি শাড়িই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

এছাড়া, শাড়ি নিয়ে বছরভর চলে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফলে প্রত্যেক পুজোয় বা বিয়ের মরশুমে এঁরা ক্রেতাদের উপহার দেন এমন শাড়ি, যাকে বলা যায় 'ডালিয়া স্পেশাল'।

নন্দিনীর পছন্দের শাড়িগুলোর মধ্যে সাদা টাঙাইলের দাম ১৬০ টাকা। ঘি-রঙা মসলিন (ব্লাউজ পিস সমেত) ৭০০ টাকা। ঢাকাই জামদানি ১২00 টাকা। কাতান সিল্ক 850 টাকা। নানা রঙের রেশমি ডুরের কালো শাড়িটি (ব্লাউজ পিস সমেত) ১৮০ টাকা।

নন্দিনী পাল ও 'ডালিয়া'-র (অজয় দত্ত) সৌজন্যে

কর্মসংস্থান

বিউটিশিয়ান কোর্স



স্বাধীন পেশা হিসেবে যে সমস্ত পেশা ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাদের মধ্যে বিশেষ একটা হল বিউটিপার্লার-এর ব্যবসা। বিউটিশিয়ানের ডিপ্লোমা বা অন্যান্য ট্রেনিং নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন এবং মাস গেলে মোটা টাকা উপার্জন করছেন এমন মহিলার সংখ্যা মহানগরী শহরতলীতে বা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য শহরেও যে কম নয় তার প্রমাণ মিলবে অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা অজস্র বিউটি পার্লার দেখে।

কলকাতায় কয়েকটি নামজাদা বিউটিশিয়ান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে যেখানে মোটা বেতনের বিনিময়ে বিউটিশিয়ান কোর্স করানো হয় – এদের মধ্যে একটি বিখ্যাত 'শাহনাজ', অন্যটি ওয়াই, ডব্লু সি এ। এ দুটি কেন্দ্র ছাড়া অল্প খরচে আপনি যেখানে এ কোর্সটি করে নিতে পারেন সেটি হল 'অনন্যা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।' লবণহ্রদের মতো জায়গায় স্টেডিয়ামের পাশে পূর্বাচল হাউসিং এস্টেটের ১২ নং ক্লাস্টারের ডি ব্লকের তিনতলায় ৬ নং ফ্ল্যাটে নিজেদের বাড়িতে অন্যান্য বহু ট্রেনিং-এর পাশাপাশি বিউটিশিয়ান কোর্সের ট্রেনিং চালু করেছেন শ্রীমতী ছবি ঘোষ। প্রায় তিনবছর আগে। ঘরোয়া পরিবেশে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বিউটিশিয়ান কোর্সের ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষিত ও স্বনির্ভর করে তুলছেন বহু মেয়েকে। আপনিও পারেন ট্রেনিংটি নিয়ে নিজের একটি স্বাধীন উপার্জনের রাস্তা তৈরি করে নিতে।

প্রায় তিনবছর ধরে শ্রীমতী ছবি ঘোষের এই 'ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার'টি চলছে। নিজে তিনি প্রায় সাত বছর ধরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের শিক্ষানবিশি করেছেন। বিউটিফিকেশন শিখেছেন কলকাতার জনৈকা জাপানি মহিলার কাছে, এছাড়া দিল্লিতেও ট্রেনিং নিয়েছেন বিউটিফিকেশনের। এখন নিজেই খুলে বসেছেন একটি ছোটখাটো ট্রেনিং সেন্টার। তাঁকে সাহায্য করার জন্য সহকারী হিসেবে আছেন স্বপ্না মোদক (প্রধান বিউটিশিয়ান) সমাপিকা দে, কল্পনা ভট্টাচার্য, তানিয়া চক্রবর্তী। এরা প্রত্যেকেই ওই ট্রেনিং সেন্টার থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বর্তমানে এখানেই বিউটিশিয়ান শিক্ষিকার বৃত্তিতে নিযুক্ত। অত্যন্ত যত্নে আন্তরিকতার সঙ্গে তারা এই ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। সম্পূর্ণ কোর্সটি দুই থেকে আড়াই মাসের। টাকা দিতে হয় এককালীন ৯৫০ টাকা। সপ্তাহে ছ'দিন বিভিন্ন কোর্সের ক্লাস হয় সকাল দশটা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত। বিভিন্ন শিফটে বিভিন্ন গ্রুপের ক্লাস চলে। সাধারণের জন্য সপ্তাহে তিনদিন অন্তত দুই থেকে আড়াই ঘন্টা চলে বিউটিশিয়ান কোর্সের ক্লাস।

মনে রাখবেন মধ্যবিত্ত তথা অল্পবিত্তের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও স্বাধীন উপার্জনের উদ্দেশে খোলা হয়েছে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি, তাই বেতনের চাপ নেই এখানে। মোট দেয় বেতন ৯৫০ টাকা একবারে না দিয়ে তিনমাসের কিস্তিতেও দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, কলকাতার বাইরে থেকে ট্রেনিং নিতে আসেন যে সমস্ত প্রার্থী তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। আড়াই মাসের কোর্সকে আরও অল্পসময়ে শিখিয়ে দেওয়া হয় তাদের। সেক্ষেত্রে ক্লাসের সংখ্যাই বেশি হয়, বেতনের কোনো হেরফের হয় না। প্রয়োজনে রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনেও বহিরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরটি খোলা রাখা হয়।

এবার আসি বিউটিশিয়ান কোর্সে কি কি শেখানো হয় সে কথায়। সর্বমোট ৯৫০ টাকার বিনিময়ে যে গোটা বিউটিশিয়ান কোর্সটি করানো হয় অনন্যা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে; তার শিক্ষণ তালিকায় আছে মেনিকিওর, পেডিকিওর, ব্লিচিং, ফেসিয়াল, ব্রাইডাল মানে কনে সাজানো (বাঙালি – অবাঙালি দু'রকম) ওয়াকসিং, থ্রেডিং, হার্বল, টিথ কেয়ার, শ্যাম্পু-ক্রীম ইত্যাদি তৈরি, হেয়ার ট্রিটমেন্ট, স্কিন কেয়ার, ক্যাম্ফার লোশন, রোজওয়াটার তৈরি ও ব্যবহার ও বিভিন্ন ছাঁদের হেয়ার কাটিং।

এছাড়া সম্পূর্ণ কোর্স না করেও আংশিক প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। মাত্র ৩০০ টাকার বিনিময়ে আপনি শিখে নিতে পারেন ফেসিয়াল, পেডিকিওর, মেনিকিওর, দু'রকম কনে সাজানো, থ্রেডিং, ব্লিচিং, ম্যাসাজ ইত্যাদি। মাত্র ১০০ টাকায় শিখতে পারেন হেয়ার কাটিং, ওই ১০০ টাকাতেই হেয়ার স্টাইল, ১৫০ টাকায় পার্মিং সেটিং ও ডাইং কেয়ার, মাত্র ২৫ টাকায় শিখুন হেনা ট্রিটমেন্ট, হার্বাল ট্রিটমেন্ট শিখুন মাত্র ১৫০ টাকায়। মনে রাখবেন প্রত্যেকটি কোর্সেই অ্যাডমিশন ফী ২০ টাকা। এবং প্রতিটি টুকরো কোর্স করতে সময় কতটা লাগবে তা নির্ভর করছে ওই কোর্সের গুরুত্বের ওপর।

এবার অনন্যা বিউটিশিয়ান কোর্স করে স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন এমন কয়েকজনের কথা বলে শেষ করব, যাতে সুকন্যার পাঠিকাদের মধ্যেও কেউ কেউ এ কোর্স করতে উৎসাহ পান, এবং এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন।

রাউরকেল্লা থেকে এসে কলকাতায় লবণহ্রদের অনন্যায় বিউটিশিয়ান কোর্স করেছেন এবং রাউরকেল্লাতেই বিউটি পার্লার খুলেছেন নন্দিনী লাহিড়ী। দুর্গাপুরে বিউটি পার্লার খুলেছেন দুর্গাপুরেরই মেয়ে তপতী ঘোষ, অন্তলিকা সাহা চিত্তরঞ্জন থেকে এসে অনন্যার ট্রেনিং নিয়েছিলেন। এখন পার্লার খুলে ব্যবসা করছেন চিত্তরঞ্জনেই। মালা ঘোষও নিজস্ব পার্লারে বসে বিউটিফিকেশন করছেন বাগুইআটিতে।

বর্ণালী দাস

ফটো : অভিজিৎ রায়

সেলাই

গ্লাস জ্যাকেট

গরমকালে অতিথি আপ্যায়নে ঠান্ডা পানীয়ের কদর সবচেয়ে বেশি। কিন্তু খুব ঠান্ডা কোনো পানীয়ের গ্লাস হাতে ধরে রাখা বেশ মুশকিল। গ্লাসের গা বেয়ে জল পড়ে, হাত ভিজে যায়। গ্লাসের গায়ে যদি একটি জ্যাকেট পরানো থাকে, তবে তা দেখতেও যেমন বাহারি, ব্যবহারেও তেমনি সুবিধে। যে রঙের পানীয়, সেই রঙের জ্যাকেট গ্লাসে পরিয়ে পানীয় পরিবেশন করুন। দেখবেন, কী চমৎকার দেখায়।



এই জ্যাকেটগুলো কুরুশে বোনা। ৪টি গ্লাস-জ্যাকেট তৈরি করতে ৪ গোলা ক্রুচেট ও একটি ১০ নং কুরুশ প্রয়োজন। ক্রুচেট পছন্দমত রঙের কিনবেন।

বোনার পদ্ধতি

অষ্টম সারি পর্যন্ত ডবল করে ও নবম সারি থেকে সিঙ্গল করে ক্রুচেট সুতো ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক সারি শেষ হবে স্লিপ স্টিচে।

সংকেত

চেন – চে. ডবল ক্রুচেট – ডি সি. সিঙ্গল ক্রুচেট – সি সি।

কয়েকটা স্টিচের পদ্ধতি

পিকট – যত ঘরের পিকট বোনা হবে, তত ঘরের চেন বুনে ১ম চেনের সংগে জুড়ে দিতে হবে।

২ – ডি সি পাফ – সুতো পেঁচিয়ে কুরুশ চেনের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার সুতো পেঁচিয়ে বের করে দুটো লুপের ভেতর দিয়ে কুরুশ টেনে নিন। আবার কুরুশে সুতো জড়ান। কুরুশ ঢুকিয়ে সুতো পেঁচিয়ে দুটো লুপের মধ্যে দিয়ে কুরুশ টেনে আনুন। সুতো পেঁচিয়ে তিনটে লুপের ভেতর দিয়ে কুরুশ বের করে নিন।

ক্রশড ডি সি – প্রথম ঘর ছেড়ে ১ ডি সি. পরে ছেড়ে আসা ঘরে ১ ডি সি।

নকশা

১ম সারি – ৪চে. (রিঙে ১ ডি সি. ১ চে) ৮ বার. স্লিপ স্টিচ দিয়ে ৩য় চে-তে জুড়ে দিন।

২য় সারি – ১ম সারির প্রত্যেক চে-এর ওপর ২টি করে সি সি করুন।

৩য় সারি – ৪ চে.* সি সি-র ওপর ১ ডি সি. ১ চে* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ ও ৫ম সারি – ২য় ও ৩য় সারির মত।

৬ষ্ঠ ও ৭ম সারি – প্রত্যেক সি সি-র ওপর ২টি করে সি সি করুন।

৮ম সারি – প্রত্যেকটি চে-এর মাঝখান দিয়ে কুরুশ ঢুকিয়ে একটি করে সি সি করুন। লাইনের শেষে সুতো কেটে দিন।

৯ম সারি – ৮ম সারি আপনার দিকে রেখে সিঙ্গল সুতো জুড়ে ১ সি সি. *৫ চে. ৩ চে ছেড়ে ১১ সি সি* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন।

১০ম সারি – ৩ চে. ৯ম সারির ৫ চে দিয়ে তৈরি লুপে ১ ডি সি. (২ ডি সি পাফ ওই একই লুপে) ৪ বার. ৮ সি সি* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। ১ ডি সি-র ওপর স্লিপ স্টিচ দিয়ে শেষ করুন।

১১শ সারি – *৩ চে. ওই একই ঘরে (১ ডি সি. ১ চে. ২ – ডি সি পাফ). এরপর (৩ চে. ১ সি সি) ৪ বার. ৩ চে. (২ – ডি সি পাফ. ১ চে. ২ – ডি সি পাফ) আগের লাইনের ২ – ডি সি পাফের ওপর. ক্রশড ডি সি ৩ বার* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন।

১২শ সারি – ১১শ সারির মত। কেবল (৩ চে. ১ সি সি) করুন এবং ৩ বার ক্রশড ডি সি করবেন না।

১৩শ সারি – ১১শ সারির মত। কেবল ৩ বার ক্রশড ডি সি-র পরিবর্তে ২ চে।

১৪শ সারি – ১১শ সারির মত। কেবল (৩ চে. ১ সি সি) ৩ বার করুন এবং ৩ বার ক্রশড ডি সি-র পরিবর্তে ৪ চে।

১৫শ সারি – ১৪শ সারির মত। কেবল (৩ চে. ১ সি সি) ২ বার ও ৪ চে-এর বদলে ৬ চে।

১৬শ সারি – ১৫শ সারির মত। কেবল (৩ চে. ১ সি সি) ১ বার ও ৬ চে-এর বদলে ৮ চে।

১৭শ সারি – ১৬শ সারির মত। তবে (৩ চে. ১ সি সি) করতে হবে না এবং ৮ চে এর পরিবর্তে ১০ চে।

১৮শ সারি *২ – ডি সি পাফ দুটির মাঝে ১ সি সি. ২ জোড়া ২ ডি সি পাফের মাঝে ২টি পিকট (প্রতিটি ৬ চে-এর). ২ ডি সি পাফ দুটির মাঝে ১ সি সি. ১০ চে-এর লুপে (৬ সি সি. ৪ চে-এর ১ পিকট. ৬ সি সি)* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। শেষে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জুড়ে সুতো কেটে দিন।

তৈরি হয়ে গেল একটি জ্যাকেট। এভাবে আরও তিনটি বুনলে একটি সেট তৈরি হবে। সব কটি বোনার পর অল্প মাড় দিয়ে শুকিয়ে নিন।

এভাবে আপনার বাচ্চার গরম দুধের গ্লাসেরও জ্যাকেট তৈরি করে দিতে পারেন। দেখবেন, নিজে হাতে গ্লাস ধরে খেতে ওর কত সুবিধে হবে। □

সঞ্চিতা রায়

ছবি : শংকর নাগ দাস

প্রেমের জোয়ারে



অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এক যুগস্রষ্টা পুরুষ। আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। মানুষ আইনস্টাইন ছিলেন সাদাসিদে, আত্মভোলা। জীবনযাপনে এই মহান বৈজ্ঞানিক কখন উচ্চকিত হতে পারেননি। প্রেমেও তিনি ছিলেন প্রসন্ন পরিতৃপ্ত, বিচ্ছেদে প্রসারিত ও উদার। তাই প্রথমা প্রেমিকা ও স্ত্রী মিলেভাকে তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থমূল্য দিয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে এলসা, সম্পর্কে নিকট আত্মীয়ার প্রেমে আইনস্টাইনের জীবন হয়েছে পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞান সাধনায় নিবিড় নিমগ্ন।

'নাঃ, ছেলেটা একেবারেই বোকা।'

প্রাইমারি ক্লাসে ছাত্রটি চুপচাপ বসে। কোলের ওপর হাত দুটো জড়ো করা। তাকে দেখিয়ে শিক্ষক বললেন, 'ছেলেটা একেবারেই বোকা। সহজ একটা জিনিসও বুঝতে পারে না।'

অন্য ছাত্ররা সবাই তার দিকে মুখ ফেরাল। চাপা হাসি তাদের মুখে। শিক্ষক বলতে লাগলেন, 'তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, অ্যালবার্ট। চটপট জবাব দাও।'

আইনস্টাইন একটুও নড়লেন না। যেন শুনতেই পাননি।

ক্লাসের সবাই চুপ। একটু উত্তেজনার ভাব। আইনস্টাইনকে আবার শাস্তি দেওয়া হবে।

শিক্ষক এবার চিৎকার করে উঠলেন, 'দাঁড়াও। যাও হলঘরে। দুপুর অবধি দাঁড়িয়ে থাকবে।'

আইনস্টাইন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বেতের পিটুনি খাওয়ার থেকে এ অনেক ভাল। হলঘরটা খুব

ঠান্ডা। দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়। তবু আজেবাজে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার হাত থেকে তো বাঁচা গেল!

আসলে অ্যালবার্ট তাড়াতাড়ি কোন কথার জবাব দিতে পারেন না। অনেক ভেবেচিন্তে বলেন। শিক্ষকের ধৈর্য থাকে না। তাই এই শাস্তি।

অনেক বছর পর। সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে বহু মানুষের ভিড়। ভিড়ের সামনের দিকে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলে। একটু পরেই ট্রেন এসে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক নেমে এলেন মাথায় সাদা বাবরি চুল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটছেন। সবাই হৈ চৈ করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ছেলেটি ভাবছে একজন মানুষকে ঘিরে কেন এত হৈ-চৈ একটু পরেই তার বাবা বললেন, 'আজকের দিনটা জীবনে কখনও ভুলো না। এই মাত্র যাঁকে তুমি দেখলে তাঁর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষদের একজন।'

এমনই ভাগ্য আইনস্টাইনের। ছাত্র-জীবনে যাঁর কপালে বোকা শিরোপা জুটেছে, পরবর্তী জীবনে তিনিই বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। অথচ, যে বৈজ্ঞানিক মতের জন্য তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে, তা বোঝাবার মত ক্ষমতা কম লোকেরই ছিল তখন। হয়ত সে-কারণেই লোকের এত আগ্রহ।

জার্মানির মিউনিখ শহরের চুরাশি মাইল পশ্চিমে উল্‌ম। ১৪ মার্চ ১৮৭৯ সালে আইনস্টাইনের জন্ম এই শহরে। তাঁর বয়স যখন এক বছর বাবা-মা তাঁকে নিয়ে মিউনিখে চলে আসেন।

স্কুলে একদম ভাল লাগে না আইনস্টাইনের। তার থেকে বাড়ি অনেক ভাল। ছোট বোন মায়া এসে তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে। মা গরম গরম খাবার সাজিয়ে দেন। চারপাশে বাগান-ঘেরা কি চমৎকার বাড়ি তাঁদের। আত্মীয়-স্বজনের অভাব নেই। সপ্তাহের শেষে তাঁরা প্রায়ই বেড়াতে যান। ধারে কাছে কোন পাহাড়ে। কিংবা ব্যাভেরিয়ার হ্রদ অঞ্চলে। আইনস্টাইনের মনে আনন্দের শেষ নেই। গ্রামাঞ্চল তাঁর খুব পছন্দ। বনের ভেতর গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ে ছবির মত। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে হয়, এর মধ্যে যদি হারিয়ে যাওয়া যায়! মাঝে মাঝে গাছের পাতা



আইনস্টাইন আর তাঁর বোন মায়া (১৮৮৫)

নিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখেন কি অদ্ভুত এর নির্মাণ কৌশল। অনেকক্ষণ হ্রদের ধারে চুপচাপ বসে থাকেন। ছোট ছোট ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে।

একদিন তাঁরা বনভোজনে গেছেন আইনসার নদীর ধারে। অ্যালবার্টের কাকা রুডি হঠাৎ বললেন, 'দ্যাখো ছেলেমেয়েগুলো কেমন হেসে-খেলে হৈ চৈ করছে, আর অ্যালবার্টটা গম্ভীর মুখে বসে আছে। আমাদের এলসাও ত ওর বয়সী! কই সে ত ওরকম নয়!' আইনস্টাইনের মা পলিন সবসময়ে

আইনস্টাইন (ছাত্রজীবন/১৮৯৬)



ছেলের পক্ষে। বললেন, 'ও চুপচাপ বসে চিন্তা করছে।' দেখো কালে-কালে ও এক বিরাট অধ্যাপক হয়ে উঠবে।' সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। অ্যালবার্ট হবে অধ্যাপক? তাহলেই হয়েছে। যা মাথা!

দিন যায়। ১৮৯৫ সালে জুরিখের বিখ্যাত পলিটেকনিক আকাডেমিতে ভর্তি হবার জন্য আবেদন জানালেন আইনস্টাইন। পরীক্ষা হল। পাশ করতে পারলেন না। কিন্তু মনের জোর সাংঘাতিক। একবছর পড়াশুনো করলেন মন দিয়ে। তারপর সুযোগ এল আকাডেমিতে ভর্তি হবার।

এখানে আইনস্টাইনের সহপাঠী মার্সেল গ্রসম্যান। তাঁরই লেখা নোটের সাহায্যে আইনস্টাইন পরীক্ষায় পাশ করলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অনেকটাই নিরাসক্ত আইনস্টাইন। তবু এই সময়েই তাঁর জীবনে এল প্রেম। প্রথম প্রেম।

তাঁর ক্লাসের এক সহপাঠিনী। নাম: মিলেভা মারিক। দেখতে গোলগাল। বেঁটে। চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্নতার অভাব। কিন্তু চোখের মণি কালো। মাথার চুলও কালো। সাইবেরিয়া থেকে মিলেভা এসেছেন বিজ্ঞান পড়তে। খুব কম সময়েই তাঁকে হাসতে দেখা যায়। অল্প কথা বলেন। তবু তাঁর উপস্থিতি ভাল লাগে আইনস্টাইনের।

অ্যালবার্ট আর মার্সেলের আলোচনায় প্রায়ই থাকেন মিলেভা। গালে হাত রেখে মন দিয়ে শোনেন আলোচনা। একদিন অ্যালবার্ট বললেন, 'আচ্ছা মিলেভা, আমরা দুজনে কথা বলি। কই তুমি তো কিছু বলো না

হেসে ওঠেন মিলেভা, 'বা: সবাই কথা বললে শুনবে কে? আমি তোমাদের শ্রোতা। নক্ষত্রের মত শ্রোতা। তোমাদের কথা খুব ভাল লাগে আমার।'

মার্সেল বলেন, 'কিন্তু আমাদের যে অস্বস্তি লাগে!'

'সে কি! কেন মনে করো, তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।'

'তা কি হয়!' আইনস্টাইন মৃদু হাসেন।

এরপর দেখা গেল মার্সেল আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছেন। মিলেভা-ই কাছে এসে গেছেন অ্যালবার্টের। এতদিনে অ্যালবার্ট যেন এমন একজন



১৯০৫ সালে আইনস্টাইন

মানুষকে পেয়েছেন যাঁর কাছে মনের সব কথা খুলে বলা যায়। একদিন বললেন, 'জানো মিলেভা, ছেলেবেলায় আমি খুব বোকা ছিলাম।'

'তাই নাকি! কই তোমাকে দেখে তো মনে হয় না।'

'অন্তত শিক্ষকরা তাই বলতেন।... আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?'

'আমার? আমার শুধু মনে হয় তোমার কথা মন দিয়ে শুনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তুমি এত সুন্দর করে কথা বলো।'

'আমি সুন্দর করে কথা বলি? তুমি হাসালে মিলেভা। ঠিকমত কথা না বলার জন্যে কত বকুনি খেয়েছি।'

'তা জানি না। তবে এখনকার তুমি অনেক সুন্দর।'

আইনস্টাইন হঠাৎ-ই অন্যমনস্ক হয়ে যান। কই, এমন করে ভালবেসে কেউ তো তাঁকে কখনও কিছু বলেনি। শুধু মা পলিন তাঁকে ভালবাসতেন, কিন্তু সে তো অন্যরকম —। হাতের ওপর চিবুকের ভর রেখে তন্ময় হয়ে যখন মিলেভা তাঁর কথা শোনে, মনে হয় সার্থক তাঁর জীবন।

অল্পদিনেই মিলেভা আর আইনস্টাইন কাছাকাছি এসে গেলেন। পলিটেকনিকে তখন তাঁদের থার্ড ইয়ার চলছে। আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন, তাঁদের দুজনের বিয়ে হবে ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ হলেই।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে বিংশ শতাব্দী সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আইনস্টাইনের বয়েস একুশ। তিনি তখন সুইটজারল্যান্ডের নাগরিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোর্থ ইয়ারের পড়া শেষ হয়েছে। এই ক'বছরে তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতাও বেড়েছে। পলিটেকনিক থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হলেন। ঠিক সেদিনই বাড়ি থেকে এল দুঃসংবাদ, এরপর আর একশ ফ্রাংক মাসোহারা পাবেন না।

এতদিনে আইনস্টাইনকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হল বাস্তবের সামনে। নিজের খাওয়া-পরার জন্যে কোনদিনই বিশেষ মাথা ঘামাননি তিনি। তা নিয়েই এবার ভাবতে হল। উপার্জনের পথ একটা চাই। তাছাড়া, মিলেভাকে বিয়ে করার কথাও স্থির করেছেন তিনি। মিলেভা নিজেও সে-দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

পলিটেকনিক আকাডেমিতেই শিক্ষকতার আবেদন জানালেন। সে আবেদন নাকচ হয়ে গেল। কিন্তু চাকরি ত একটা চাই। একরকম বাধ্য হয়েই আবেদন করলেন বার্নের পেটেন্ট অফিসে। সুইটজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন। চাকরি মিলল। জুরিখের ছাত্র-জীবন শেষ হল। শুরু হল বার্নের চাকরিজীবন।

এই সময়ে তাঁর মনের অবস্থার কথা ডায়েরির পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'একেই তো বলে পিছু ধাওয়া। জীবনে উন্নতির জন্যে টাকা-পয়সার পিছু ধাওয়া করা কোনদিনই আমি চাইনি। চেয়েছি অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস। বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে জুতো সেলাই করতেও আমি রাজী।...... আমার মাঝেমাঝে ইচ্ছে হয় শূন্যের ওপর এমন একটা দ্বীপে গিয়ে বাস করি যেখানে আমি ছাড়া কেউ নেই, ব্যক্তিগত প্রয়োজন বলে কিছু নেই, যেখানে শুধু চিন্তাই সব কিছু।

১৯০৩ সালে আইনস্টাইন বিয়ে করলেন মিলেভাকে। তাঁর প্রেম পূর্ণতা পেল। মনের মধ্যে আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে যেন। মিলেভাও খুশি আজ। বয়েসে একটু বড় তিনি আইনস্টাইনের থেকে। তবু তাঁর মন নিজে থেকেই শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে। আইনস্টাইনের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রেম তাঁর মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে।

বার্ন শহরের একটা বাড়ির চারতলায় সংসার পেতেছেন তাঁরা। ছোট একটা ঘর। সাধারণ আসবাবপত্রে সাজানো। কিন্তু তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। এখান থেকে নদীর দৃশ্য দেখা যায়। পালতোলা নৌকো ভেসে চলেছে যেন অজানা পথের সন্ধানে। সূর্যাস্তের স্তিমিত আলো এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। দারুণ ভাল লাগে। কিংবা সকাল বেলায় যেদিন আকাশ পরিষ্কার, আল্‌প্‌স পর্বতের চূড়ো সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে থাকে। দুজনের মনের মধ্যেই তখন আনন্দের সুর গুনগুন করে ফিরতে থাকে। আইনস্টাইন বলেন, 'মিলেভা, তুমি খুশি হয়েছ তো?'

মিলেভা গভীর আলিঙ্গনে মুখ লুকোন স্বামীর বুকের মধ্যে। তারপর হেসে বলেন : 'তুমি বোঝো না? আমি খুশি হয়েছি কি না —?'

পেটেন্ট অফিসের কেরানী হিসেবে আলবার্ট বেশ খুশি। ইঞ্জিনিয়ারদের

সংগে তাঁর দিন কাটে ডেস্কে বসে। প্ল্যান আর আবিষ্কার সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘেঁটে। অফিসের কাজ দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তাঁর। বাকি সময়ে মাথার মধ্যে একটা বিষয়ই ঘুরতে থাকে – বিজ্ঞান।

যতদিন যায় আইনস্টাইন ততই তাঁর আপেক্ষিকবাদ নিয়ে বেশি করে ভাবতে শুরু করলেন। এই সময় তাঁর একটি ছেলে হল। নাম রাখলেন : হান্স আলবার্ট। এখন তাঁর প্রতিদিনের কাজ ছেলেকে গাড়িতে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ভাবনার জাল বোনা।

দ্বিতীয় পুত্র এডওয়ার্ডের জন্মের সময় তাঁর মন পুরোপুরি বিজ্ঞানের জগতে। সে মন যেন এক গবেষণাগার। ভাবেন আর লিখে রাখেন।

১৯০৫-এর জুন মাস। তিরিশ পাতা কাগজ ডাকে পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইন। জার্মানির লিপজিগ শহরের বিজ্ঞান-বিষয়ের পত্রিকার জন্যে। মহাশূন্য, কাল, সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁর এতদিনের সব ভাবনা লেখা আছে ওতে।

সেদিন আইনস্টাইন বড় ক্লান্ত। সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপে আস্তে আস্তে পা রাখছেন। চারতলার ঘরে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ছেলেরা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আইনস্টাইন গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মিলেভা তাঁর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। এতদিনে আইনস্টাইন বুঝেছেন তাঁর জীবনে প্রেম স্বপ্নের


আইনস্টাইন ও এলসা

মতই অলীক। মিলেভাকে ঘিরে তাঁর যা কিছু স্বপ্ন সব মিলিয়ে গেছে। মিলেভা খামখেয়ালী। বদমেজাজী।

হয়ত তিনি নিজেও সম্পূর্ণ নন। সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। এ ব্যাপারে বড় উদাসীন তিনি। তাই হয়ত মিলেভা কথায় কথায় তর্ক করে। ঝগড়া করে। একটুও ভাল লাগে না তাঁর।

বিছানায় শুয়ে পড়তেই মিলেভা বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'তুমি অসুস্থ নাকি? ডাক্তার ডাকি?' আইনস্টাইন বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'না-না। ক্লান্ত লাগছে। ও কিছু না। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কাজে যাও। আমি একটু বিশ্রাম করি। চলে গেলেন মিলেভা। আইনস্টাইন তখন ভাবছেন, এই কাজ শেষ করতে

শ্রীমতী এলসা আইনস্টাইন


যে শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে কোন কয়লাখনিতে কাজ করেও ঠিক ততটা করতে হত না।

প্রকাশিত হল আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। বিজ্ঞানী মহল হতবাক। তাঁদের চিন্তার জগতে নতুন আলো জ্বলে উঠল যেন। জুরিখ আকাডেমি তাঁকে সাদরে ডেকে নিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য। তাঁকে 'ডক্টরেট অব ফিজিক্স' উপাধিতে ভূষিত করল।

১৯১৪ সালে আইনস্টাইন বার্লিনের প্রুশিয়ান আকাডেমি অব সায়েন্সে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। জুরিখের বাস তুলে দিয়ে বার্লিনে নতুন জীবন শুরু। কিছুদিন পর দুই ছেলেকে সংগে নিয়ে মিলেভাও বার্লিনে এলেন। মিলিত হলেন আইনস্টাইনের সংগে। কিন্তু আইনস্টাইন তখন একেবারেই অন্য জগতের মানুষ।

ঠিক হল, এবারের গ্রীষ্মের ছুটি সবাই মিলে সুইটজারল্যাণ্ডে কাটাবেন। মিলেভা ছেলেদের নিয়ে আগেই চলে গেলেন। কিন্তু আইনস্টাইনের যাওয়া হল না। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই সময়ে তিনি বার্লিনেই থেকে যান। মাঝে কয়েকবার সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে দেখে আসেন ছেলেদের। আর মিলেভাকে।

১৯১৬ সালে শেষবারের মত দেখতে যান আইনস্টাইন। সংসারের প্রতি কোন টানই তখন নেই আর। এক বন্ধুকে বলেন, 'পরিবারের সংগে এটাই আমার শেষ মিলন। এই মতের পরিবর্তন আর কখনও হবে না।'



প্রিন্সটনে আইনস্টাইন (১৯৩৮)

মিলেভা ওঁর বিজ্ঞান-চর্চায় ব্যাঘাত ঘটান। নিজের গবেষণায় কিছুতেই মন বসাতে পারেন না। এ-দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারেন না আইনস্টাইন।

১৯১৭ সালে দুজনের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তবে তার আগে একদিন মিলেভাকে একান্তে ডেকে আইনস্টাইন বলেন, 'মিলেভা, আমি আশা করছি নোবেল প্রাইজ পাব। পেলে পুরস্কারের সব অর্থ তোমার। আর একটা কথা জেনো, আমার নিজস্ব পথে আমি তোমার কাছে চিরকাল সত্য থেকেছি, ভবিষ্যতেও থাকব।'

মিলেভা মুখ তুলে তাকাতে পারেননি আইনস্টাইনের দিকে। তাঁর মনের মধ্যে অপরাধ-বোধ।

আইনস্টাইন কথা রেখেছিলেন। ১৯২১ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়ে তার সমস্ত টাকা দিয়ে দেন মিলেভাকে।

বার্লিনের অবসর সময় আইনস্টাইনের কাটে কাকা রুডির বাড়িতে। ইনিই একসময় বলেছিলেন, 'অ্যালবার্ট হবে অধ্যাপক! তাহলেই হয়েছে!' আজ তিনিই এক বিরাট পার্টির আয়োজন করেছেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে ভরে গেছে বাড়ি। উপলক্ষ আইনস্টাইনের সায়েন্স অ্যাকাডেমিতে যোগদান।

আইনস্টাইনের খুড়তুতো বোন এলসাও আছেন তাঁদের ভেতর। এঁর কথাই সেই বনভোজনের দিন রুডি বলেছিলেন, 'কেমন হাসিখুশি!' আজ অবশ্য সে-হাসি আর নেই। তিনি এখন বিধবা। ছোট্ট দুটি মেয়ে নিয়ে বাবার কাছেই থাকেন। মিউনিখের উচ্ছল কিশোরী আজ পরিপূর্ণ নারী – মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি।

এঁদের সংগে সেদিনের বিকেলটা আনন্দেই কাটল। আইনস্টাইনের প্রিয় সব খাবারেরই ব্যবস্থা ছিল। শেষে দেওয়া হল কফি আর কফি কেক। কফি কেক খেতে খেতে আইনস্টাইন বললেন, 'চমৎকার লাগছে। আমার মা ঠিক এইরকম কফি কেক তৈরি করতেন।'

এলসা হাসলেন, বললেন, 'সে রকমই তো লাগবে। এই কেক তৈরি করতে পলিন আন্টি তো আমাকে শিখিয়েছিলেন।'

'তাই বলো।'

চলে যাবার সময় আইনস্টাইনকে এগিয়ে দিতে এলেন এলসা। বললেন, 'একখানা গাড়ি ডাকতে বলি! অনেক রাত হয়েছে, অনেক দূরে যেতে হবে তোমায়।'

আইনস্টাইন হেসে উঠলেন। নিজের পা-দুখানা দেখিয়ে বললেন, 'এর চেয়ে ভাল গাড়ি হতেই পারে না। আজকের রাতটা চিরদিন মনে থাকবে আমার। হাঁটতে হাঁটতে অনেক কিছু চিন্তা করার সুযোগ পাব।... আজ আসি।... গুড নাইট।'

... গুডনাইট। শীগ্‌গির আর একদিন এসো অ্যালবার্টল!'

অ্যালবার্টল! আইনস্টাইনের মনে পড়ল, অনেকদিন এ-নামে তাঁকে কেউ ডাকেনি। এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আসব।'

তারপর থেকে প্রায়ই আসতে লাগলেন। এলসার সান্নিধ্য ভাল লাগে তাঁর। কোথা দিয়ে যেন দ্রুত সময় কেটে যায়। একদিন এলসা বললেন, 'শোনো, তোমার স্বাস্থ্য দিন দিন যা হচ্ছে –'

'কেন? ভালই তো আছি আমি!' বাধা দিলেন আইনস্টাইন।

'না, মোটেও ভাল নেই। এখন থেকে হোটেল রেস্তোরাঁয় খাওয়া বন্ধ। তার বদলে এখানে খাবে তুমি। কি, রাজী?'

'রাজী না হয়ে উপায় আছে? এক্ষুনি কান্নাকাটি শুরু করবে না?'

'মোটেও না। আমার কি!'

সেদিন থেকে এলসাদের বাড়িতেই খাওয়া শুরু হল আইনস্টাইনের। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হল। সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠানে প্রায়ই যেতে হয় তাঁকে। কিন্তু নিজের পোশাকের দিকে একটুও নজর নেই। এলসার সতর্ক দৃষ্টি সেদিকে। একদিন বললেন, 'কি ভেবেছ বলো তো?'

'কেন? কি হয়েছে?'

'ঢিলেঢালা জামাকাপড় আর ময়লা জুতো না পরে গেলেই নয়? জানো, জার্মানরা এর জন্যে তোমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে?'

'কেন?'

'ওরা পছন্দ করে জাঁকজমক!'

'বেশ তাহলে তুমিই ব্যবস্থা করো।'

'হ্যাঁ। আমিই করব।'

১৯১৭ সালে হঠাৎ আইনস্টাইন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। পেটের অসুখ। খারাপ ধরনের। এলসার হাত ধরে একদিন গভীর আবেগে বললেন, 'এলসা, আমি সেরে উঠব তো? আমার যে অনেক কাজ বাকি –'

'কি আবোল-তাবোল বকছ! শিগ্‌গির সেরে উঠবে।'

'এলসা, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'তোমার সেবা না পেলে আমি বেঁচে উঠতাম না এলসা। এ-কদিন তুমি যা করেছ। আমার চিন্তার জগতে সৃষ্টির আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন একটু শূন্যতা –। তুমি সে শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছ।... তুমি আমার পাশে থাকতে পারো না, আজীবন?'

এলসা বলেন, 'আমায় একটু ভাববার সময় দেবে?'

'বেশ। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি –'

'তাড়াতাড়িই বলব।'

এর ক'দিন পরেই এলসা জানালেন, 'আমি রাজী। ভেবে দেখলাম তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন আছে, আমার জীবনেও তোমার –'

আইনস্টাইনের মনে হল, তাঁর জীবনে

আবার সূর্য উঠছে। নতুন সূর্য। এলসার আগের পক্ষের মেয়েদের তিনি নিজের সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করলেন। এলসা ঘর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলেছে পুরোদমে। আইনস্টাইন যুদ্ধকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। আর তাঁকেই থাকতে হচ্ছে জার্মানিতে। যুদ্ধে লিপ্ত একটা দেশের রাজধানী শহরে। একদিন এলসাকে বললেন, 'জানো এলসা, এরা আমাকে যুদ্ধে জড়াতে চায়। কিন্তু আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেও যুদ্ধে জড়াতে পারবে না।'

আইনস্টাইন সুইস ছিলেন বলে সুইস নাগরিকরা অসময়ে নিয়মিত খাবার পাঠিয়েছে আইনস্টাইনকে। যুদ্ধের কারণে বার্লিনে তখন খাবার পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও খাওয়ার অযোগ্য। এলসা আপ্রাণ চেষ্টা করেন আইনস্টাইনকে ভাল খাবার খাওয়াতে। পেটের অসুখ তাঁর। সে অসুখ আবার শুরু হলে সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে এলসার। তাই তিনি কৃতজ্ঞ সুইস নাগরিকদের কাছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯১৮ সালে। একদিন ভোরবেলা। এলসা একটা প্যাকেট এনে আইনস্টাইনের সামনে রাখলেন। বললেন, 'এগুলো রয়েল সোসাইটির পাঠানো সূর্য গ্রহণের সব ফটো। এইমাত্র তাদের লোক এসে দিয়ে গেল।'

এলসা প্যাকেট খুলতে লাগলেন। আইনস্টাইন দেখে বললেন, 'চমৎকার।' এলসা বললেন, 'সত্যি চমৎকার। এবার তোমার প্রমাণ হাতে এসে গেল। কি বলো?'

'প্রমাণ? কিসের প্রমাণ?'

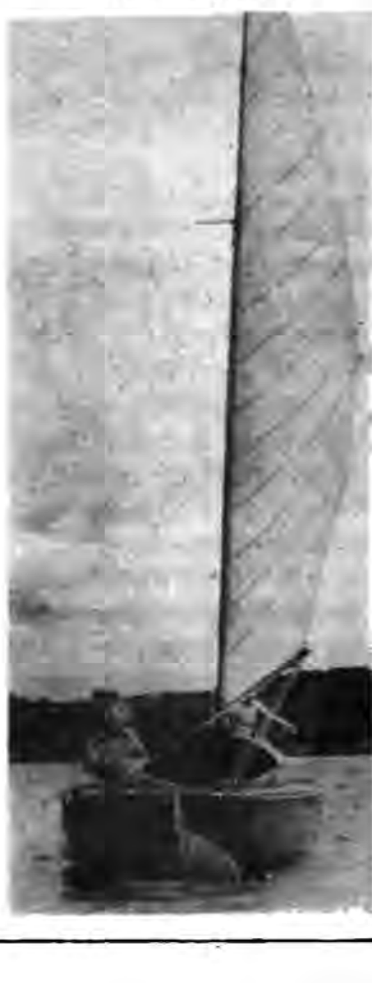
'কেন তোমার আপেক্ষিকবাদ যে ঠিক তার প্রমাণ। কোনো কোনো বিজ্ঞানী যে আজও তোমার মত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এবার আর তা পারবেন না।'

হো হো করে হেসে উঠলেন আইনস্টাইন। হতভম্ব এলসার চোখমুখ লজ্জায় লাল। হাসতে হাসতে আইনস্টাইন বললেন, 'না-না। আমি কখ্খনো প্রমাণ চাইনি। প্রমাণ চেয়েছেন তাঁরা।' নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বরাবরই স্থির নিশ্চিত তিনি।

আইনস্টাইনের নামে বস্তা বোঝাই চিঠি আসতে লাগল বাড়িতে। এলসা তার ভেতর হাবুডুবু খেতে লাগলেন। অনেক কাজ। চিঠি বাছাই করা। জবাব লেখা। আইনস্টাইন পরিহাস করে বললেন, তুমি এসব নিয়ে ভেঙে পড়ো না। সাধারণ লোকের এটা একটা সাময়িক খেয়াল। তিন মাস পরেই তারা আমাকে ভুলবে। সেই সঙ্গে ভুলবে আমার আপেক্ষিক মতবাদ। এলসা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'কখ্খনো না। তোমাকে চিরদিন মনে রাখতে হবে লোকের।'

বিজ্ঞানবিদদের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্যে আইনস্টাইনকে প্রায়ই যেতে হয় বিভিন্ন শহরে। এলসাকে ছেড়ে কোথাও গেলে তাঁর মন খারাপ লাগে। এলসারও দিন কাটে উদ্বেগের মধ্যে। একদিন স্বামীর সুটকেশ সাজাচ্ছেন আর সমানে বলে চলেছেন, 'যেদিন বক্তৃতা দেবে সেদিন বিকেলে পরবে কালো স্যুটটা। ভুলে যেও না যেন।' আইনস্টাইন হাসতে হাসতে বললেন, 'এলসা, তুমি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বড্ড মাথা ঘামাও!'

আইনস্টাইন কাপুথের লেকে



ক'দিন পর ফিরলেন আইনস্টাইন। সুটকেশ খুলে এলসা দেখলেন, কালো স্যুট তেমনই ভাঁজ করা আছে। এলসা বিস্মিত, 'এ কি! কালো স্যুটটা পরোনি তুমি!'

'ওই যা! একদম ভুলে গেছি।' দুষ্টু ছেলের মত আইনস্টাইন হাসতে লাগলেন এলসার দিকে চেয়ে। বললেন, 'ব্যাপার কি জানো, আমি কি বলছি সে কথা শুনতেই লোকেরা এসেছিল, পোশাকের ফ্যাশান দেখতে তো আসেনি। তাই ওতে কিছু ক্ষতি হয় নি।'

এলসা নিরুপায়ভাবে চেয়ে রইলেন। আইনস্টাইনের দিকে। তারপর না হেসে পারলেন না। আইনস্টাইন দু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন এলসাকে।

এরপর আইনস্টাইন দম্পতি ঘুরে বেড়ান দেশে বিদেশে। আমেরিকায়। জাপানে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। অভ্যর্থনার যেন কোন শেষ নেই। শেষে ঠিক করলেন আমেরিকায় থাকবেন। নিউজার্সির প্রিন্সটন শহরে।

ছোট্ট একটা সাদা বাড়ি। বাড়ির দরজায় ঝুলছে আঙুর গাছের লতা। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। জীবনে সুখ আছে। আছে প্রশান্তি। আইনস্টাইন লিখেছেন: 'আমরা এখানে খুব সুখী। বোধহয় খুব বেশি সুখী।' দুজনের বয়েস হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। তবু প্রেমের জগতে দুজনেই চিরনবীন। কিন্তু সুখ চিরদিনের জন্যে নয়। ১৯৩৬ সালে মারা গেলেন এলসা।

আইনস্টাইনের মনে হল, জীবনের একটা দিক যেন একেবারেই শূন্য হয়ে গেল। প্রতিদিন ভোরে একাই হেঁটে বেড়ান। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে যান কনসার্ট শুনতে। মনে পড়ে, একসময় তিনি বেহালা বাজাতেন। এখন তাতে অনেক ধুলো জমে। এলসা নেই। কে বলবে, 'বাজাও না। আর একটু?'

শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পরবর্তী সংখ্যায় : পাবলো পিকাসো)

অনবধানবশত গত ১ এপ্রিল '৮৮ সংখ্যার 'প্রেমের জোয়ারে', কার্ল মার্কস লেখাটির শুরুতে ১৮৫১ সালের জায়গায় ১৯৫১ এবং জেনি মার্কস (১৮৪০) ক্যাপসানটি ১৯৪০ ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

যেদিন পাগলা গারদে কেউ যাবে না.....

যন্ত্রণার একটা উদ্দেশ্য আছে। একটা কাজ হাসিল করে দেয়। বলে দেয়, আপনার মধ্যে কোথাও একটা গোলযোগ ঘটেছে।

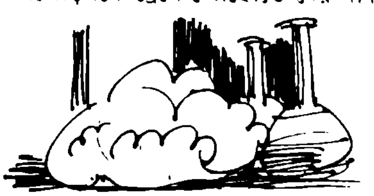
যন্ত্রণা তখনও আপনাকে অতিষ্ঠ করে যায়। তখন আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না – কিন্তু যন্ত্রণা টিকে থাকে।

স্বভাবতই, তখন একটা প্রবল ইচ্ছে হয় যন্ত্রণার টুঁটি টিপে ধরার। অনেক বছর আগে মানুষ মোটামুটি আচমকা সেই পদ্ধতি জেনে গিয়েছিল। প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন অ্যাসিরিয়ার অধিবাসীরা জানত আফিম গাছ অথবা পোস্ত গাছের ফলের শুকিয়ে যাওয়া কাঁচা রসে আফিম থাকে। চুষে খেলে যন্ত্রণা কমে যায়, শরীর আর মনের কষ্ট কমে, অবসাদ দূর হয় নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগে।

বীজাধার পেকে উঠলে তার ওপর থেকে নিচে কয়েক জায়গায় চিরে দেওয়া হয়। ঐ চেরা জায়গা থেকে দুধের মত সাদা রস বেরিয়ে বীজাধারের গায়েই শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। এই কালো পদার্থই হল আফিম।

যাই হোক, একইভাবে দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরাও কোকো গুল্ম চিবিয়ে খেত – ইউরোপীয়রা সেদেশে পা দেওয়ার অনেক আগে।

১৮০৬ সালে আফিম থেকে মরফিন কেমিক্যাল আলাদা করে বের করে নেওয়া হয় এবং দেখা যায় যন্ত্রণা লাঘব করতে মরফিন অনেক বেশি দক্ষ। আফিমের চাইতেও শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা অনেক বেশি। কোকো পাতা থেকে আলাদা করে বের করে নেওয়া হয় কোকেন এবং স্থানীয় চেতনা-নাশক অর্থাৎ অ্যানেস্থেটিক হিসেবে কাজে লাগানো হয় ১৮৮৪ তে। কিন্তু যন্ত্রণা কমানোর এই দ্রব্যগুলোর একটা বদ দোষ আছে। সয়ে যায়। তখন মাত্রা বাড়াতে হয়। নইলে কাজ হয় না। মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে শরীর মহাশয়ের তখন এদের নইলে যন্ত্রণা সহজে কমাতে পারে না। বন্ধ করে দিলেই এমন লক্ষণ দেখা যায় যে তার ধকল সামলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। 'হেরোইন' মরফিনের আর এক রূপান্তর। মরফিনের চাইতে অনেক জোরালো। বন্ধ করে দিলে ধাক্কা মারে আরও বেশি। হেরোইনকে একবার শরীরের কাজে লাগালে, মরফিনের চাইতেও অনেক জোরে কামড়ে ধরে শরীরকে। ছাড়া মুশকিল। ব্রেনের কতকগুলো জায়গায় নার্ভের আলোড়ন পৌছলে ব্রেন সাড়া দেয় যন্ত্রণার অনুভূতি জাগিয়ে। যন্ত্রণা কমানোর দ্রব্যগুলো ব্রেনের এইসব অঞ্চলে আস্তরণ ফেলে দেয় – নার্ভের আলোড়নকে ব্রেনে পৌছোতে দেয় না।



অনেক সময়ে আবেগের চাপে যন্ত্রণাকে টের পাওয়া যায় না। সাধারণ অবস্থায় এই যন্ত্রণাই টের পাইয়ে ছাড়ে। নিজে থেকেই ব্রেন থেকে বেরিয়ে আসা কেমিকাল ব্রেনের এইসব অঞ্চল পাহারা দেয় বলে এই কান্ড ঘটে। কেমিক্যালগুলোর নাম এনডরফিনস। ১৯৭৫-য়ে এদের পশুর ব্রেন থেকে আলাদা করে বের করা হয়। সবচেয়ে সরল এনডরফিন গড়ে ওঠে পাঁচটা অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। সজীব টিশুর প্রোটিন মলিকিউলে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিডের চেন। প্রোটিন মলিকিউলে থাকে কুড়ি রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড যদি কুড়িটার একটা করেও থাকে একটা পেপটাইডের পাঁচটা অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে, তাহলে পেপটাইডের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ লক্ষ। প্রত্যেকটা পেপটাইডের আকার একটু না একটু আলাদা। এনডরফিনের আকার খাপ খেয়ে যায় ব্রেনের যন্ত্রণার গ্রাহক অঞ্চলে।

পেনকিলার হিসেবে এনডরফিনদের একটা ত্রুটি আছে। ব্রেন তাদের দরকার মত তৈরি করে নেয়, দরকার ফুরিয়ে গেলে পরিপাটি ভাবে ভেঙেও দেয় (অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে আলাদা করে দেয়)। এনডরফিনদের যখন বাইরে থেকে ব্রেনে চালান করা হয়, ব্রেন তাদের ঝটপট ভেঙে ফেলে (নিজের তৈরি নয় বলে)। ফলে, যন্ত্রণা কমানোর কাজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মরফিনের মলিকিউলকে কিন্তু সহজে ভাঙা যায় না – তার কাজও চলে অনেকক্ষণ।

তা সত্ত্বেও আশা আছে, এনডরফিনদের দিয়ে যদি কোনভাবে কাজ করানো যায়, তারা গা-সওয়া মাত্রা-বাড়ানো পর্যায়ে নাও পৌছোতে পারে। কারণ, শরীর তাদের শরীরের ধর্ম দিয়ে নাড়াচাড়া করে।

ব্রেনের টিশুতে আর যে কী আছে, আজও তা জানা নেই। কেউ জানে না আরও পেপটাইড ব্রেনে আছে কিনা। পাঁচটা অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে যদি লক্ষ লক্ষ প্রতিটি আলাদা রকমের পেপটাইড তৈরি হতে পারে, তাহলে ছ-টা অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে কোটি রকমের হতে পারে, সাতটা দিয়ে শতকোটি রকমের। কি তারও বেশি। ডজন কয়েক প্রতিটি আলাদা ধরনের এমন পেপটাইডও পেতে পারি যাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আছে ব্রেনের ওপর, এই পেপটাইডদের আমরা সামান্য পাল্টে নিতে পারি – আরও দক্ষ করে তোলার জন্যে।

এমনও হতে পারে যে গুরুতর মানসিক অসুখ (সিজোফ্রেনিয়া নামে যাদের পরিচিতি) হয়তো এইসব পেপটাইডদের অতি উৎপাদন বা স্বল্প উৎপাদনের জন্যেই ঘটছে। সেক্ষেত্রে, আমরা রোগ চিনে নিতে পারব এবং মনের রোগকে কেমিক্যালের মাধ্যমে সারিয়েও দিতে পারব – পাগলাগারদে আর কাউকে আটকে থাকতে হবে না।

সেদিন হয়তো অনেক দূরে, কিন্তু ভাবনাটা সুখের। □

বিশ্ব বসু



রূপসী বাংরিপোষী

ভুরকুন্ডা, ধাতি, বন করঞ্জ আর গামারের জংগলে ঢাকা ঘন সবুজ এক একটা আস্ত পাহাড় কোলের কাছে নিয়ে এই সন্ধ্যায় টুলুবাবুর বাংলোর সবুজ লনে হালকা কেদারাগুলোয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। তখন পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ল সদ্য ফোটা খৈ-এর মতো জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্না পাহাড় ছাপিয়ে লাল কাঁকরের মাঠ পেরিয়ে আপনার পায়ের কাছে পৌঁছতে বুঝতে পারলেন আজ নয়,







ফটো : সোমেশ্বর ভৌমিক

পূর্ণিমা আগামীকাল। কারণ বাংরিপোষীর জ্যোৎস্নায় জুঁই ফোটার কথা। এমন অভিজ্ঞতা কস্তুত যে কেউ সঞ্চয় করতে পারে – একটা সপূর্ণিমা ছুটি পকেটে নিয়ে কলকাতা থেকে মাত্র ২২৮ কিলোমিটার দূরে সবুজ পাহাড় ঘেরা বাংরিপোষীতে পৌঁছতে পারলে। শুনতেই ২২৮ কিলোমিটার, আসলে ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার এই গ্রামটিতে পৌঁছন খুবই সহজ। কারণ ৬নং জাতীয় সড়ক চলে গেছে বাংরিপোষীর বুক চিরে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পরিবহণের বাস গুমটি থেকে সকাল সাড়ে ছটার কেওনঝাড়গামী যে সরকারি বাসটি ছাড়ে সেটা আপনাকে পাক্কা ১২ টায় বাংরিপোষী পৌঁছে দেবে। তবে জামশালার চেকপোস্টে ট্রাকের ভিড় থাকলে এক দেড় ঘণ্টার হেরফের হয়ে যেতে পারে। আর ঘণ্টা মিনিট নিয়ে যদি হিসেব করার দায় না থাকে তো পুরো রাস্তাই ট্রেনে যেতে পারেন। হাওড়া থেকে রাতের ট্রেন পুরী প্যাসেঞ্জার বা মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেসে চাপলে রূপসী স্টেশনে নামিয়ে দেবে ভোর বেলা। রূপসী থেকে ছোট লাইনের সকাল ছটা দশের টয় ট্রেন ছবির মতো পথ পেরিয়ে অরণ্য আর পাহাড়ের কোল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেলা ১২টা নাগাদ বাংরিপোষী স্টেশনে পৌঁছে দেবে। স্বাভাবিকভাবেই বাসে ভাড়া কম। আঠাশ টাকার মতো। আরো কম ভাড়ার বেসরকারি দুটি বাস বাবুঘাট থেকে ছাড়ে – তবে সে বাসে না যাওয়াই ভাল। ভিড় এবং মন্দ গতিতে যাত্রার আনন্দটাই দেবে মাটি করে। তবে নিজস্ব গাড়ি থাকলে তো কথাই নেই। গাড়িতে রসদ ভরে নিয়ে ভোর থাকতে রওনা দিন, বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছে যাবেন।

থাকার জায়গা দুটি। এক, টুলুবাবুর বাংলো; দুই, ওড়িষ্যা সরকারের পান্থনিবাস। দুটি মিলিয়ে বাসযোগ্য ঘর মোট পাঁচটা। বাংরিপোষীতে থাকার জন্য টুলুবাবুর বাংলোটা পাওয়ার চেষ্টাই সর্বপ্রথম করা উচিত। কারণ এটি কলকাতা থেকেই বুক করা যায় আর পাহাড়ের গা বেয়ে জ্যোৎস্নার লুটোপুটি দেখতে হলে তো টুলুবাবুর বাংলোর লন ছাড়া কোনো উপায় নেই। অবশ্য আপনি যদি ভালুক চিতার ভয় না পেয়ে জ্যোৎস্না-ধোয়া পথে পথে উধাও হতে পারেন তাহলে তো সে বেড়ানো অন্য এক মাত্রা পেল। তবে গেরস্ত ভ্রমণকারীদের সাবধান করে দিই : ওটি করবেন না, যেকোন সময়ে ঘোরতর বিপদ ঘটতে পারে। বরং ৪৮/এ,রাসবিহারী অ্যাভিনউ, কলকাতা-২৬-এর ঠিকানায় মুখার্জি গ্যারেজে চলে যান। ওখান থেকেই বাংরিপোষীর বাংলো বুক করা যায়। ডবল বেডের ঘর পিছু ৪0 টাকা ভাড়া। তিনটে ঘর এক সঙ্গে নিলে ১00 টাকা। যা আয়োজন তাতে এক একটি ঘরে ৫-৬জন অনায়াসে থাকা যাবে।



আর পান্থনিবাসে থাকতে হলে হাতে সময় নিয়ে চিঠি লিখুন এই ঠিকানায় : ট্যুরিস্ট অফিসার, গভ: অবস ওড়িশা ট্যুরিস্ট অফিস, বাগরা রোড, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, ওড়িশা। খালি থাকলে পেয়ে যাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, বুকিং-এর চিঠিটি পকেটে না পুরে খবরদার বাংরিপোষী যাবেন না। মাথা গোঁজার অন্য কোন জায়গা নেই। খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবতে হবে না। বাংরিপোষীর জল পেটে পড়লে এত বেশি খিদে পাবে যে রসনার চেয়ে উদরের প্রতিই অধিক যত্নবান হতে হবে। তাছাড়া টুলুবাবুর বাংলোর কেয়ারটেকার বুধুয়ার বউ যে রান্না আপনাকে খাওয়াবে তা যেকোনো বাঙালি রান্নার চেয়ে কম সুস্বাদু নয়। এ বাদেও পাশেই হোটেল আছে, হোটেল না বলে চটি বলাই ভাল। ৫-৬ টাকার মধ্যে নিরামিষ আহার সারতে পারেন। মাছ মাংস খেলে খরচ কিছু



বেশি পড়বে। তবে বাংরিপোষীর বাজার থেকে চাল, ডাল, ডিম আর মাছের ভাগা কিনে বুধুয়ার বউকে দিলে আহার পর্বটি আরও ভালভাবে মেটে। ইদানীং ট্যুরিস্ট বেড়ে যাওয়ায় মুরগি বেশ আক্রা।

কলকাতার একজোড়া বাবুবিবি আমাদের পাশের ঘরে উঠেছেন – জানতে চাইলেন, 'এখানে কি কি দেখার জিনিস আছে মোশাই। একটা দিন আছি, টকাটক দেখে নিতে হবে।' বাবুটিকে আমি জ্যোৎস্না বোঝাতে যাইনি; ভয়ে, কেবল পাহাড়, নদী, আর



অরণ্যের কথা বলেছিলাম। বাবুটি তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হননি। তবে আপনি নিশ্চয়ই হবেন। কারণ ভোরবেলা উঠে শেষ বসন্তের হালকা কুয়াশা ছাপিয়ে চোখের সামনে অকনঠাকুরের ওয়াশের কাজ করা পাহাড় বন দেখবেন। তারপর মুখ হাত ধুয়ে কিছু শুকনো খাবার ব্যাগে ভরে স্টান পাহাড়ে উঠে যাওয়া পিচ রাস্তা ধরে হাঁটবেন। আপনার দুপাশে লাল কাঁকড়ের মাঠ, আর একটু পরেই জঙ্গলের শুরু। এখনি সন্তুষ্ট হওয়ার দরকার নেই। না এমনকি হালকা হলুদ চিরুল ফুলে গোটা পাহাড় ছেয়ে থাকতে দেখলেও না। মোটা পাঁপড়ির ওই চিরুল ফুল হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন দুই একটা পাথর টপকালেই। যত ওপর দিকে উঠছেন জঙ্গল ততই ঘন হচ্ছে। এভাবে বেশ খানিকটা যাবার পর একটা তীক্ষ্ণ বাঁক পেরুলে বনদুর্গার মন্দির। মন্দির বলতে মূলত পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার সারি। দূর দূর থেকে মানুষ আসে পুজো দিতে। সব ট্রাক এবং বাসই একবার মন্দিরের সামনে থামে, পুজো না দিয়ে কেউ বাঁক পেরোয় না। লোক বিশ্বাস বনদুর্গাকে তুষ্ট না করলে দুর্ঘটনা হবেই। মন্দিরের পিছনে একটা পাহাড়ি ঝোড়া আছে। শীতের পরে তার অস্তিত্ব থাকে না।



ছবি : মিলন দত্ত

অবশ্য বর্ষার সময় বা পুজো নাগাদ গেলে পাহাড়ে ওঠার পথে অনেকগুলো ঝরনা দেখতে পাবেন। ফেরার পথে রোদ কম থাকলে হেঁটেই নামুন পাহাড় থেকে, না হলে ট্রাক ধরতে পারেন, মুহূর্তেই পৌঁছে দেবে বাংলোর সামনে। বন দেখে হয়ত বিশেষ মন ভরবে না, তবে জেনে রাখা দরকার, এই বনে দাঁতাল শুয়োর, ভালুক, চিতা এবং হাতিও আছে। কাছেই সিমলিপাল। বাংরিপোষীকে বলা যায় সিমলিপালের দুয়ার। আসলে সিমলিপাল পাহাড় শ্রেণী শুরু হল এই বাংরিপোষী থেকেই।

বাংলোর ঠিক পিছনে একটা দুটো গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় ঘাগড়ি পাহাড়ের পায়ের কাছে। সেই চিরুল ফুলের সমারোহ আর সাদা রঙের নুড়ি পাথরের মোরাম। চারপাশে, যেদিকেই চাইবেন উঁচু-নিচু ছোট বড় পাহাড়। পাহাড়ের এই স্তব্ধ, গম্ভীর, সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে অন্তত একবার বিস্মিত হতেই হবে। তবে ঘাগড়ি পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ ঘাগড়ি পাহাড়ে ভালুকের বড় উপদ্রব।

বাংরিপোষী বাজার পেরিয়ে হেঁটে যেতে পারেন কুসুমবাল্দীর দিকে। পাহাড় আরো গায়ের ওপর, বন সেখানে আরও ঘন। ৬ কিলোমিটার পথ। মাত্র দু কিলোমিটার হাঁটলেই বুড়িবালাম নদী। আদিবাসীরা বলে বুড়িবড়ঙ। বড়ইপনি পাহাড় থেকে নেমে এই নদী চাঁদিপুরের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বসন্তের শেষে নদীর তেজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তবু সে রূপও মন ভোলায়। পাহাড়ি নদী ঠিক যেমনটি হয়। ফেরার পথে কাছে-দূরের পাহাড়ের সারি কিংবা ছোট ট্রেনটির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বাজারে ফিরে সন্তোষের কাছে টিফিন সেরে নিন। সন্তোষের হাতের টিফিন খেতে ভুলবেন না। আর কোনো ভাবে বুধবারটি হাতে পেলে তো আদিবাসীদের হাটই পেয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় খেড়িয়া, খাসি, ভীল, সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ ঘরে ফেরে হাট সেরে। তাদের পায়ে পা রেখে ফিরে আসুন বাংলোয়। লনে বসুন। একটু পরেই চাঁদ উঠবে পাহাড়ের ওপারে, যেদিকে বিষই, যশিপুর, বড়ইপনি। তারপর, আজ তো পূর্ণিমা, জুঁই ফোটা জ্যোৎস্না পাহাড় ছাপিয়ে লাল কাঁকড়ের মাঠ পেরিয়ে আপনার পায়ের কাছে। □

মিলন দত্ত



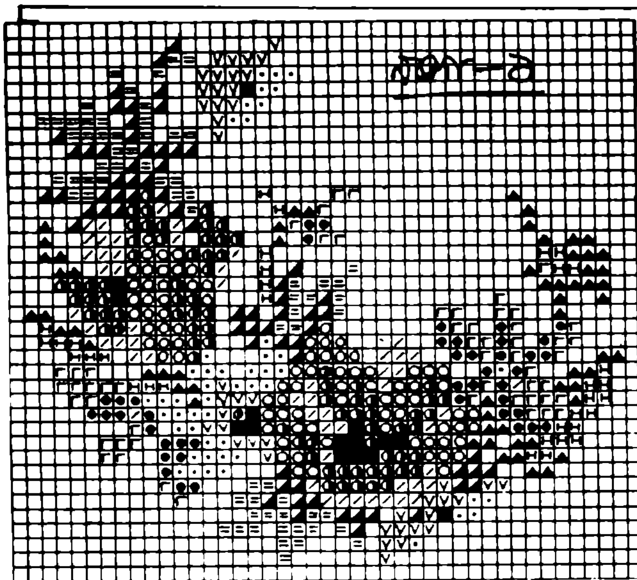
দেয়ালচিত্র

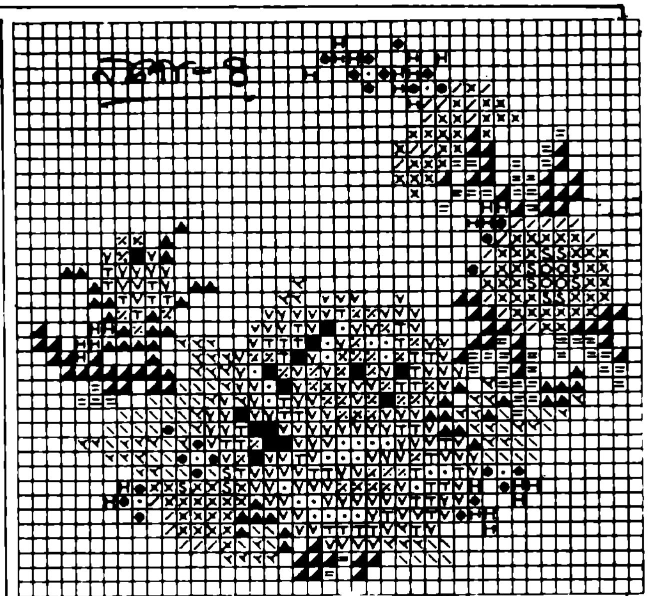
ঋতুবাহার

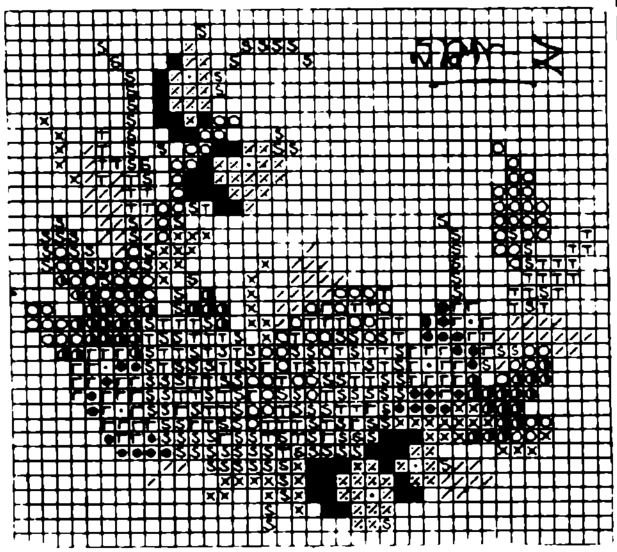
বিভিন্ন মরশুমি ফুলের চারটি খণ্ডচিত্রে সম্পূর্ণ হয়েছে দেয়ালচিত্র 'ঋতুবাহার।' ক্রশ স্টিচের এমব্রয়ডারিতে তৈরি এই দেয়ালচিত্রের প্রয়োজনীয়

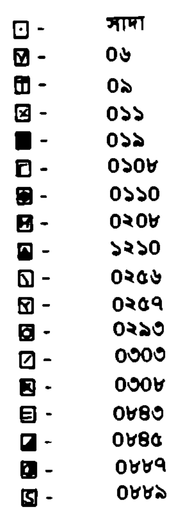
উপকরণ :

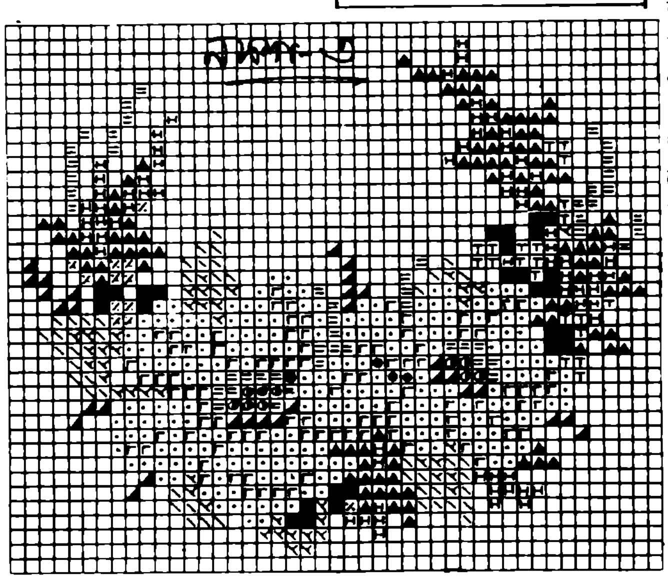
মাদুর কোটস অ্যাংকর লাছি সুতো. ৪৬২৫। সাদা/০৬/০৯/০১১/০১৯/০১০৮/০১১০/০২০৮/০২১০/০২৫৬/০২৫৭/০২৯৩/০৩০৩/০৩০৮/০৮৪৩/











০৮৪৫/০৮৪৭ এবং ০৮৮৯ – প্রত্যেক শেডের একটি করে লাছি প্রয়োজন। প্রতিটি লাছির দুটি সুতো একসংগে সূচে পরিয়ে সেলাই করতে হবে। এছাড়া, ক্রশ স্টিচে এমব্রয়ডারির উপযোগী (সহজে ঘর গোনা যায় এমন) ৪০ সে. মি. × ৪০ সে. মি. কাপড়, পশম, কার্পেট সেলাইয়ের কার্পেট সূচ, ছবি বাঁধানোর ফ্রেম ও বোর্ড প্রয়োজন।

৪০ সে. মি. × ৪০ সে. মি. কাপড় থেকে সমান মাপের চারটি চৌকো টুকরো কেটে নিন। চৌকো কাপড়ের মাঝ বরাবর লম্বা ও চওড়ায় এক সারি করে টাঁক সেলাই দিন। তারপর ঘরের হিসেব ঠিক রেখে চারটি কাপড়ে চারটি ভিন্ন নকশা ক্রশ স্টিচে এমব্রয়ডারি করুন। কাপড়ের মাঝের সুতোটি টাঁক সেলাই দিয়ে সঠিকভাবে চিহ্নিত থাকায় প্রয়োজনবোধে এক একটি নকশা চারভাগে ভাগ করে নিয়ে সেলাই করতে সুবিধে হবে। তাছাড়া, কাপড়ে ঘর গুনে নকশা তোলার সময় চারপাশে সমান মাপের কাপড় বাদ দিয়ে ঠিক মাঝের অংশে এমব্রয়ডারি করতে কোনো ভুল ত্রুটি হবার সম্ভাবনা থাকবে না। প্রতিটি নকশার কোন অংশে কোন সুতোর ব্যবহার হবে তার নির্দেশিকা সংগে দেওয়া হল।

এমব্রয়ডারির শেষে প্রত্যেকটি কাপড়ের টুকরোর উলটো পিঠে ইস্ত্রি বুলিয়ে নেবেন। এরপর মাপমত চারটি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে চারটি নকশা রেখে বাকি কাপড় টান টান করে চারপাশে পিন দিয়ে আটকে দিন। এবার পছন্দসই ফ্রেমে বাঁধিয়ে লম্বালম্বি সারিবদ্ধভাবে দেয়ালে টাঙান।

'অ্যাংকর ডিজাইন স্টুডিও'-র সৌজন্যে



ঝংকার ঃ সুজিত গুহর নতুন ছবি

সৈনিক রায়

বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে আরতির। বাবা গ্রামের মাস্টারমশাই। তাঁর বড় ইচ্ছে মেয়েকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিয়ে দেবেন। মেয়ের কাছে মাস্টারমশাই কথাটা পাড়লেন। মেয়েকে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন ভাবতেও যেন বুক ভেঙে যায় তাঁর। কিন্তু কী করবেন, মেয়ে তো! বাবার প্রস্তাব শুনে আরতি বলে – না, বাবা। আমি বিয়ে করতে পারব না।

কথাটা বলেই আরতি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢোকে শংকর। আরতিকে ওইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। মাস্টার মশাইয়ের কাছে এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে – কী হয়েছে মাস্টারমশাই?

মাস্টার – রবিবার পাত্রপক্ষ আরতিকে দেখতে আসছে। ও বলছে বিয়ে করবে না।

শংকর – ও, এই ব্যাপার? আমি মেমসাহেব কে রাজী করাব। আপনি একদম ভাববেন না।

শংকর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মাস্টারমশাই বিষণ্ণ দুচোখ ভাসিয়ে দেন ক্যামেরার দিকে।... কাট্। অন্য শট।। মাস্টারমশাই ও আরতি।

মাস্টারমশাই – তোকে এ সুখ থেকে কী করে বঞ্চিত করি বল?

আরতি – আমি চলে গেলে কে তোমাকে দেখবে বাবা?

মাস্টারমশাই আরতির চিবুক তুলে ধরেন।

মাস্টার – কিন্তু বিয়ে তো তোকে দিতেই হবে।...

কাট্। পরিচালক নির্দেশ দিলেন লাঞ্চ ব্রেকের। নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওর ফ্লোরে সেট পড়েছিল 'ঝংকার' ছবির। পুরো ফ্লোর জুড়ে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। গরীবের আস্তানা।

অনেকগুলি বক্স সফল বাংলা ছবির পরিচালক সুজিত গুহ শুরু করেছেন ঝংকার। একইসংগে চলছে বন্দিনী ও আশা-ভালবাসার কাজ। হিন্দি ছবির পরিচালকদের মতোই সুজিত ব্যস্ত। একসংগে একাধিক ছবি করার নজির ইদানীং কালে দেখা যায় না। সুজিত কলকাতা স্টুডিওর সাবেক আমলের ব্যস্ত পরিচালকদের মতই কাজ করছেন একসংগে একাধিক ছবির।



সুমনজিৎকে শিল্পীং পড়াচ্ছেন পরিচালক



শট শুরুর আগে ক্যামেরার পজিশন দেখে নিচ্ছেন ক্যামেরাম্যান পুণীমা.

ঝংকার ছবিটি নির্মিত হচ্ছে ভুলভুলি প্রোডাকসন্স-এর ব্যানারে। কাহিনী দেব সিংহ, চিত্রনাট্য তপেন্দু গাঙ্গুলি, সংগীত রাহুল দেববর্মণ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন : প্রসেনজিৎ, **দেবশ্রী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,** শমিত ভঞ্জ, গীতা দে, জর্জ বেকার, অন্তরা সিন্‌হা, চিন্ময় রায়, অনুপকুমার, মন্মথ মুখার্জি, রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী, সৌমিত্র ব্যানার্জি, সমীর মুখার্জি, মা: স্বর্ণেন্দু প্রমুখ।

লাঞ্চ ব্রেকে কথা হচ্ছিল 'ঝংকার'-এর প্রধান সহকারী পরিচালক সমীর চক্রবর্তীর সংগে। আলাপচারিতায় সমীরবাবু বললেন, ঝংকারের গল্পটা এরকম : এক ডাফলিওয়ালা (জর্জবেকার) মেয়ে মঞ্জুকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ায়। কোন এক জায়গায় গান গাইবার সময় ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ের মধ্যে মেয়ে মঞ্জু হারিয়ে যায়। ডাফলিওয়ালা একা চলে আসে একটা মন্দিরে। সেখানে এসে দেখে এক মা ছেলেকে পাশে রেখে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয় ডাফলিওয়ালা। মানুষ করতে থাকে। ছেলেটিও বড় হয়। পালিত বাবার কাছে গান শেখে। রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ায়। এভাবেই এসে পড়ে এক গ্রামে।

এই গ্রামে আছেন এক মাস্টারমশাই। আছে তার মেয়ে আরতি। ডাফলিওয়ালা ছেলেটি যার নাম শংকর, তার সংগে সখ্যতা গড়ে ওঠে আরতির। আরতি কখন যেন শংকরকে ভালবেসে ফেলেছে। শংকর টের পায়না কিছু। আরতির বিয়ে ঠিক হয় অন্য গ্রামে। কিন্তু পণ দিতে না পারায় সে বিয়ে হয়নি। শোকে-চিন্তায় মাস্টারমশাই পঙ্গু হয়ে যান। চলে আসেন বনগ্রামে বোনের বাড়ি। এই বোনের দেওর ছিল ডাকাত। সে মেয়ে বিক্রি করত। আরতিকেও বিক্রি করার মতলবে একটা বাজে চরিত্রের ছেলের সংগে বিয়ে দিতে চায়। এরকমই সময়ে শংকরের সংগে দেখা হয়ে যায় মঞ্জুর। মঞ্জুকেও ঐ দুশ্চরিত্র ছেলেটি বিয়ে করেছিল।

এরপর ঘটনার ঘনঘটা। শংকর-আরতি-মঞ্জু চলে আসে এক বস্তিতে। বস্তি বাড়ির দাদা (শমিত ভঞ্জ) ওদের বিয়ে দেবার চেষ্টা করে।... তারপর ? এরপর আর বলেননি সমীরবাবু। বাকিটা রুপোলি পর্দায়।



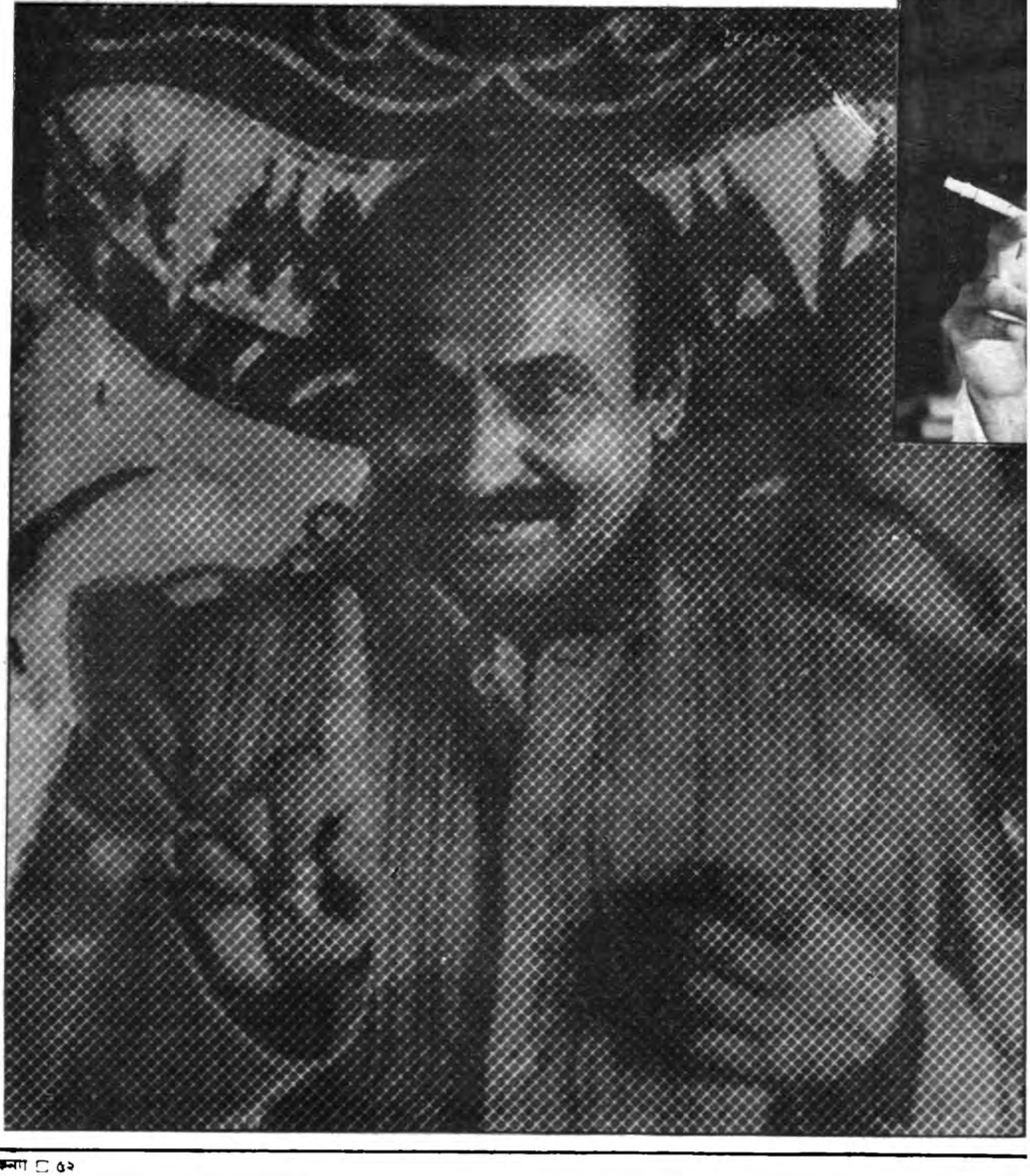


সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় • দেবশ্রী



ফটো : অর্ধেন্দু রায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে সন্তোষ দত্ত





প্রয়াত সন্তোষ দত্তকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় খুব কাছ থেকে দেখেছেন। অনেকদিন ধরেই সঙ্গে ছিলেন সুখে দুঃখে ভালবাসায়। সৌমিত্রবাবুর কাছে তাই আসা সন্তোষ দত্ত সম্বন্ধে আরো অজানা কিছু জানার জন্য।

বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ। স্থান বিশ্বরূপা থিয়েটার। 'ফেরা' নাটক চলছে। সৌমিত্রবাবুর পাশে বসে আছেন অভিনেতা প্রেমাংশু বসু, নির্মল ঘোষ। বললাম, সন্তোষদার সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অগোছালো স্মৃতিগুলোকে কাছে নিয়ে এসে বলতে লাগলেন – সন্তোষদার সঙ্গে প্রথম কবে আলাপ মনে পড়ছে না। অনেকদিন আগে রূপকার-এর চলচ্চিত্তচঞ্চরী নাটকে 'ভবদুলাল'-এর অভিনয় দেখি। অসাধারণ। সেই প্রথম ভাল লাগা। তখন থেকেই শুরু। কবে যে অনেক কাছে এসে পড়লাম বুঝতে পারিনি। সুখে দুঃখে সবসময় তাঁকে কাছে পেয়েছি। ওঁর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। কোনো অসুবিধা হলেই ছুটে যেতাম। সাজেশন পেতাম। আপন করে কাছে টেনে নিতেন। সন্তোষদা ছিলেন ব্যক্তিগত বন্ধু কাম দাদা। আমার বারবার মনে হয়েছে, ওঁর মতো টোটাল মানুষ খুব কম দেখেছি। একেবারে সংমিশ্রণ চরিত্র। বড় অভিনেতা, বাকপটু, প্রাণবন্ত মানুষ, হৃদয়বান পুরুষ – এইসব মিলিয়ে এক অনাচরিত্র।

অভিনয়ে স্বকীয়তা ছিল। এই আজকাল যেমন এ তার মতো সে ওর মতো এরকম নয়। সন্তোষদা চলছিলেন নিজস্বভঙ্গী নিয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বললেন ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, রবি ঘোষ যেমন এক একজন দিকপাল, এক একজন ইনস্টিটিউশন, সন্তোষ দাও ছিলেন এঁদেরই মতো। ওঁর মতো কৌতুক অভিনেতা এদেশে খুব কম দেখা গেছে। কৌতুকাভিনেতা বললে ভুল হবে তাঁর মতো চরিত্রাভিনেতা বিরল। 'গ্রেসফুল' না হলে বড় কমেডিয়ান হওয়া যায় না। সন্তোষদা ছিলেন গ্রেসফুল। মনে পড়ে 'সোনার কেল্লা' ছবির শুটিং-এর সময় যখন উটের পিঠ থেকে নেমে আমি এক সারসাইজ করছি, আর সন্তোষদাও শরীরটাকে ঠিক রাখবার চেষ্টায়। আহা! কি রিদিম। অসাধারণ ঐ অংশটা। ওরকম রিদিমিক না হলে কি ওই অভিনয় করা যায়? কী অসাধারণ লেগেছিল বলো তো সেই দৃশ্যটা?

প্রশ্ন করলাম, প্রথম কোন ছবিতে এক সঙ্গে কাজ করেন?

প্রথম কাজ খুব সম্ভবত সত্যজিৎ রায়-এর তিনকন্যা-র 'সমাপ্তি' অংশে।

'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় সন্তোষদার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছিল?

না হয় নি। আমার মনে হয় এই ডবল প্রফেশন ওনাকে বিব্রত করেছে। আরও



এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এটা অবশ্যই বলা যায় দর্শকরা যতদিন বাংলা ছবি দেখবেন ততদিন সন্তোষদাকে মনে রাখতেই হবে। বিশেষ করে জটায়ুকে।

আমি বললাম – আপনার কি মনে হয় না সত্যজিৎ রায় যেভাবে ওকে ব্যবহার করেছেন অন্য পরিচালকরা সেভাবে ব্যবহার করতে পারেনি বা করেননি?

হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, কয়েকটা ছবি ছাড়া কোনোটাই মনে রাখার মতো নয়। আসলে ওঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়গুলিতে আমি ওঁর সঙ্গে থেকেছি তাই অন্যান্য চরিত্র মনে ধরেনি।

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন?

পরোপকারী মানুষ ছিলেন। কত লোক যে তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি একজন সফল আইনজীবী ছিলেন। শুধু অভিনয় জীবনেই নয়, বাস্তব জীবনেও অত্যন্ত মজার মানুষ ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর জানার আগ্রহ ছিল।

শুনলাম সত্যজিৎ রায় ফেলুদার ছবি আর করেন না, আপনার কি মনে হয় অন্য কেউ যদি এই ছবি করেনও

অসম্ভব জটায়ু অন্য কাউকে ভাবতেই পারি না। আমার কখনও কখনও মনে হয় সন্তোষদা ছিলেন বলেই 'জটায়ু' চরিত্র এভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

সন্তোষদার সঙ্গে কোন নাটকে অভিনয় করেছেন কি? – না করিনি এই ক্ষোভ রয়ে গেল। পরিকল্পনা ছিল একসঙ্গে অভিনয় করার। হোল না।

বেশ কিছুক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে চুপ করলেন। ঘটনার শব্দ। নাটক শুরুর জানান দেওয়া হচ্ছে।

আবার বলতে লাগলেন, আমার কাছে এখন এক ভয়ঙ্কর শোকের সময়। একে একে নিভিছে দেউটি। এ-জগতে অনেকেই চলে গেলেন। বড়ভাই হারানোর কষ্ট ভোগ করছি। আমি সন্তোষদার সম্বন্ধে এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারছি না। নানা স্মৃতি ভিড়করে আছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কোনোতাকেই খুলতে পারছি না। জটায়ু সন্তোষদাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কারো পক্ষে জটায়ুকে ভোলা সম্ভব নয়।

সাক্ষাৎকার : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

কৃত্রিম উপগ্রহ কারিগরি-
কৌশলে সমস্ত বিশ্ব এখন
আপনার দূরদর্শনের পর্দায়
– শুধু চাবি ঘোরানোর
অপেক্ষায়। কিন্তু
দূরদর্শনের ছবির মিছিল
তাৎক্ষণিক। আপনার
প্রয়োজনের এই মুহূর্তে
বিশ্বের ধমনীর গতি
স্থায়িভাবে রেকর্ড করে
সুদৃশ্য পাতার মোড়কে

সেন্টার-টেবিলে বিশ্ব



পরিবর্তন

আপনার ড্রইং রুমের সেন্টার টেবিলে।
পাতা উল্টে দেখুন....

আসল ব্যাপারটা কী ?

প্রাত্যহিক প্রভাতী সংবাদপত্রে সংবাদের মিছিল। সংবাদপাঠের পর আপনার তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু মনে জাগে অতৃপ্তি। আপনার মনে হয় এসব তো ঘটনার রিপোর্ট মাত্র। ঘটনাটা ঘটল কেন ? আড়ালে আসল ব্যাপারটা কী? যেমন ধরুন, কলকাতা এবং আশেপাশের বাজারগুলি একের পর এক আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। এ খবর আপনি জানেন। কিন্তু পুড়ে কেন যাচ্ছে জানেন কি ? 'পরিবর্তন' উল্টে দেখুন, ঘটনার নেপথ্যে ঘটনার অন্তর্তদন্তমূলক দুঃসাহসী প্রতিবেদন।

..মাসের শেষে সাড়ে তিন টাকা কেজি

মাসের শেষে সারা মাসের সংবাদপত্রের স্তূপকে আপনার মনে হয় জঞ্জাল। তখন ডাক পড়ে কাগজওয়ালার। সাড়ে তিন টাকা কেজি দরে সে আপনার জঞ্জাল সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'পরিবর্তন' আপনার সেন্টার টেবিল থেকে ঢুকে যাবে বইয়ের আলমারিতে – সপ্তাহের পর সপ্তাহ – মাসের পর মাস – বছরের পর বছর। কারণ 'পরিবর্তন'-এ প্রকাশিত হাজারো তথ্য যে কোন সময় আপনার প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

রাজীব গান্ধী ও ফুলগ্রামের নীলিমা সোম

রোনাল্ড রেগন, মিখাইল গর্বাচেভ, রাজীব গান্ধী সংবাদের কেন্দ্রে। যে কোন সংবাদ সাময়িকীর মত 'পরিবর্তন'-এও এঁদের জন্য ব্যয়িত হয় পাতার পর পাতা – কিন্তু আমরা মনে করি – এই জটিল সময়ে, এই সব রথী-মহারথীদের পাশাপাশি জীবনযুদ্ধের অতি সাধারণ যোদ্ধারও জীবনকথা না বলা হলে একটি সাময়িকপত্র সম্পূর্ণ হয় না। তাই ফুলগ্রামের নীলিমা সোমের কথা এখানে স্থান পায় সমমর্যাদায় রাজীবের পাশাপাশি। তাতে রাজীব গান্ধী যাই মনে করুন না কেন।

'পরিবর্তন' অপরিবর্তনীয়

আর তাই 'পরিবর্তন' অপরিবর্তনীয়। আপনি একবার 'পরিবর্তন' পড়া শুরু করলে আর অন্য কোনো কাগজে আপনার পাঠাভ্যাস পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে কোনো সংখ্যা থেকেই পড়া শুরু করে দেখুন না কেন!

খো<u>শ গপ্প</u>



'দেহি চটিযুগলম্'

একজোড়া লেডিজ চটি হাতে নিয়ে হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একটি ছেলে। বাচ্চা কোলে নিয়ে একটি মেয়ে ছুটছে তার পেছন পেছন। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল : তাপস না? না না, তাপস পাল ব্রিজের ওপর ছুটবে কেন? ছেলেটা ওর মত দেখতে।... নাঃ, এটা তাপসই। নিশ্চয়ই কোনো শুটিং-টুটিং হচ্ছে। দূর, শুটিং হলে লোকজন, ক্যামেরা-ট্যামেরা থাকত না? ট্রেনে বসে হাঁফ ছাড়লেন তাপস পাল। যাক, শেষ পর্যন্ত ধরা গেল! আউটডোর শুটিং-এ সপরিবারে যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর। বাড়ি থেকে বেরোতেই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর ব্রিজের মুখে এসে দেখেন এমাথা থেকে ওমাথা সারবন্দী গাড়ি দাঁড়িয়ে। এদিকে ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। নিরুপায় হয়ে বউ-মেয়েকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়। নন্দিনীর পায়ে পেনসিল হিলের চটি। ওই ফ্যাশনের চটি পরে কি আর দৌড়োনো যায়! কিছুতেই তাপসের সংগে তাল রাখতে পারছিলেন না। শেষে মরীয়া হয়ে তাপস-নন্দিনীকে খুলে দিতে বললেন চটিজোড়া। লোকে যা ভাবে ভাবুক, ট্রেনটা তো ধরা যাবে। বাধ্য মেয়ের মত 'পদপল্লব'-এর বদলে ফ্যাশনের চটিজোড়া নন্দিনী তুলে দিলেন তাপসের হাতে।



বাবুঘাটে রসিক চোর

'বাবুঘাটে গে রেস্টুরেন্টের সামনে চলছিল বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'তুফান' ছবির শুটিং। রাস্তার এপারে ময়দানের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সাদা অ্যামবাসাডার। পরিচালকের গাড়ি। গাড়ির ভেতর একটা ব্রিফ কেসে রয়েছে তুফান ছবির কন্টিনিউটি স্টিলস ও স্ক্রিপ্ট। পাশে ছবির নায়িকা নয়না দাস-এর অভিনয়ের গহনার বাক্স। তাতে রয়েছে শুধু 'তুফান' নয় ওর অভিনীত অন্যান্য ছবিরও গহনাগুলো। ড্রাইভার গাড়ি লক করে গেছেন চা খেতে। এমন সময় গাড়িটির পাশে এসে দাঁড়াল আরেকটি অ্যামবাসাডার। নেমে এল চার পাঁচ জন লোক। বীরেশবাবুর গাড়ির লক ভেঙে শুধু মাত্র বীরেশ বাবু ও নয়নার বাক্স দুটো নিয়ে উধাও। খবর পাওয়া মাত্র থানা-পুলিশ। শেষ সংবাদ : বাক্স দুটোর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর বাক্স দুটো না পাওয়া গেলে বীরেশবাবুর 'তুফান' আর নয়নার তুফান তোলা শেষ হবে কি না জানি না। তবে বাবুঘাটের রসিক চোর যে বীরেশবাবুর চেয়ে বেশি 'তুফান' তুলতে পারে তা দেখিয়ে দিল।

শক্তি আউট!

বেলুড়ে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। মঞ্চে গান গাইছিলেন শক্তি ঠাকুর। এমন সময় হাজির হলেন মুনমুন সেন, তাপস পাল। 'তুমি কত সুন্দর' ছবির পরিচালক মনোজ ঘোষ মুনমুন ও তাপসের হাত ধরে মঞ্চে উঠলেন। শক্তি তখন মাঝ পথে গান গুটিয়ে উইংসের আড়ালে। মুনমুন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নমস্কার, এবার আমি যাই।' সংগে সংগে দর্শকদের চিৎকার – একটা কবিতা বলুন। মুনমুন বললেন, আমি তো কবিতা জানি না।

– তাহলে কুমোর পাড়ার গরুর



গাড়িটাই বলুন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন মুনমুন। ওর অস্বস্তি কাটাতে এগিয়ে এলেন মনোজ ঘোষ। তিনি বললেন, আমার ছবির নায়ক নায়িকা ছিলেন মুনমুন আর তাপস। ওরা আমার ছবির একটা ডায়লগ বলবেন।

তাপস বললেন, তোমায় আমি ভালবাসি।

মুনমুন : তুমি কত সুন্দর।

উইংসের আড়াল থেকে শক্তি ঠাকুর দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন : খুব সুন্দর বলেছিস। এবার বাড়ি যা।

ততক্ষণে দর্শক শ্রোতারা চলে যেতে শুরু করেছেন। শক্তি বুঝে গেছেন গান আর জমবে না।

অর্ধচন্দ্র

দূরদর্শনে নতুন ধারাবাহিক 'গল্পসল্প'



এপিঠ-ওপিঠ' সিরিয়ালে সুবীর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা দূরদর্শনের ধারাবাহিক নাটকগুলির সঙ্গে অচিরেই সংযোজিত হচ্ছে 'গল্পসল্প' নামে ৬টি ধারাবাহিক নাটক। 'মুভি-মিল' নামে একটি নতুন সংস্থা এটির উদ্যোক্তা। বিভিন্ন লেখকের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে এই নাট্যমালা। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও স্টেপার রাইগ।

এরইমধ্যে 'গহিন রাতে' (বনফুল) ও 'এপিঠ ওপিঠ' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর কাহিনীদুটির শুটিং শেষ হয়েছে। 'গহিন রাতে' ছাড়াও 'পাশাপাশি', 'জাগ্রত দেবতা'র কাহিনীকারও বনফুল।

দূরদর্শনের গতানুগতিক চিন্তা ও নাট্যধারার বাইরে 'গহিন রাতের' কাহিনী। যেখানে দেখানো হচ্ছে এক ভদ্রলোক (কল্যাণ চ্যাটার্জি) যাচ্ছেন মফস্বলে শ্বশুরবাড়িতে। শেষ বাস চলে গেছে। অথচ যেতেই হবে। রাতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে ডাকাতের হাতে সর্বস্বান্ত হয়েও শ্বশুরবাড়ি গেলেন। স্ত্রী (অনসূয়া মজুমদার) হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীকে পরতে দিলেন ধুতি। অবাক হয়ে দেখলেন পরনের ধুতিটা তাঁরই। যেটা কিছুক্ষণ আগেই ডাকাতরা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেছে। থানায় গেলেন অভিযোগ দায়ের করতে। সেখানে গিয়েও তিনি 'বিপন্ন-বিস্ময়'-এর প্রতীক। কারণ, খোয়া যাওয়া হাতঘড়িটা হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন দারোগাবাবু। জানলেন, ডাকাতি করা তাঁর শ্বশুরকুলের ব্যবসা। তিনি, আর ফিরলেন না। রাতেই চলে গেলেন স্টেশনে, নিজের বাড়ি যাবার জন্য। ধাপার বামুনঘাটা অঞ্চলে নৈশকালীন শুটিং শেষ হয়েছে। এর চিত্ররূপ ও পরিচালক হচ্ছেন শৈবাল মিত্র।

'এপিঠ-ওপিঠ'-এর শুটিং শেষ হয় দক্ষিণ কলকাতায় গরচা রোডের একটি বাড়িতে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। যেখানে এক ভাইয়ের কারখানায় লক আউট। স্ত্রী (শ্রীলা মজুমদার) ও শিশুসন্তান (সুদীপ চন্দ)-কে নিয়ে থাকেন সুবীর (রলি) মুখার্জি। অচল সংসার। শেষ পুঁজি স্ত্রীর গয়নাও বিক্রি হয়েছে। আশার আলো নেই। ভাবছেন বড় ভাইয়ের সংসারে ফিরে যাবেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন সপরিবারে বড়ভাই সেখানে উপস্থিত। কারণ, তাঁরও কারখানা বন্ধ। এবং সংসার অচল। এটির পরিচালক মলয় ভট্টাচার্য। দুই তরুণ শৈবাল মিত্র ও মলয় ভট্টাচার্য ভাগাভাগি করে তিনটি কাহিনী পরিচালনা করছেন।

শ্রীলা মজুমদার ও পরিচালক মলয় ভট্টাচার্য



বাকিগুলির শুটিংও এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে শেষ হবে। দূরদর্শনের জন্য এই কাহিনীগুলির এখনও কোনও স্পনসরশিপ পাওয়া যায়নি। তবে পেতে অসুবিধে হবে না বলে শৈবাল ও মলয়ের স্থির বিশ্বাস।

তাঁরা আরও জানালেন, সুরপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজি গল্প 'পাউন্ড অফ ফ্লেশ' স্টেপার বাইগের জার্মান গল্পের ভাষান্তর। ধারাবাহিকের অন্যান্য কাহিনীগুলির বিভিন্ন চরিত্রায়ণে আছেন কণিকা মজুমদার, নির্মল ঘোষ, শৈলজা রায় প্রমুখ। তবে সুবীর মুখার্জি এর আগে গৌতম ঘোষের 'পার' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের সাধুবাদ পেয়েছেন। গ্রুপ থিয়েটারের শিশুশিল্পী সুদীপ চন্দও এই ধারাবাহিকের অন্যতম আকর্ষণ নিঃসন্দেহে।

শৈবাল ও মলয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রম হচ্ছে স্বল্প বাজেটের কাহিনীতে অনেক নামী-দামিদের ভিড় করাননি। সেই সঙ্গে গল্পও নিয়েছেন নামীদের সঙ্গে অনামীদের।

দীপঙ্কর পাল

ফটো : শৈবাল মিত্র

শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের আসর

১১ – ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা পার্ক ইউনিয়ন ক্লাব তাঁদের তেত্রিশ বছর পূর্তি উৎসব বেশ সমারোহের সংগেই উদ্যাপন করলেন কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে।

তিনদিন-ব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের অধিবেশন।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনটি ছিল সারারাতব্যাপী। ওইদিন প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল: প্রধানত ওড়িশী নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর টানেই। কত্থক নাচে সেদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হল। শিল্পী ছিলেন ইন্দ্রাণী চৌধুরী। শিব-বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন শিল্পী। পরে ধামারে কিছু চক্রধার পরণ পরিবেশিত হল। ক্রমে ধামার থেকে চলে আসেন ত্রিতালে। এর পর রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক একটি নাচ। সবশেষে তারানার সংগে একটি নাচও ছিল। শিল্পী ইন্দ্রাণী চৌধুরীকে ধন্যবাদ, এক ঘন্টা ব্যাপী একটি পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য। তবলায় গোপাল মিশ্রের হাতটি বেশ মিষ্টি।

দ্বিতীয় শিল্পী বাহাদুর খাঁ। সরোদে রাগ জয়জয়ন্তী বাজিয়ে শোনান। ধ্যানমগ্ন আলাপ (যদিও সামান্য সময়ের জন্য)। পরে কাফি-সিন্ধুতে বিলম্বিত ও দ্রুত ত্রিতালে গৎ বাজালেন। মোটামুটি সুন্দর অনুষ্ঠান। তবলায় অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় সার্থক সহযোগিতা করেছেন।

মেসকুর আলি খাঁ (তৃতীয় শিল্পী) গাইলেন রাগ মালকোষ। মালকোষ ভৈরবী ঠাটের। রাগটির প্রকৃতি গম্ভীর এবং এই রাগটি ভক্তিমিশ্রিত করুণরসের রাগ। বলতে দ্বিধা নেই আলাপের অংশ (মালকোষ) শিল্পী বড় বেশি একঘেয়েমিতে ভুগেছেন। তাঁর ভরাট গলার আলাপ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। তবে তান ও সরগম-এ সাবলীলতা লক্ষণীয়। সব শেষে তরানা। সাদামাটা অনুষ্ঠান।

চতুর্থ শিল্পী ছিলেন সংযুক্তা পাণিগ্রাহী। সংযুক্তার প্রথম নিবেদন 'মংগলাচরণ'। এরপর ক্রমান্বয়ে 'পল্লবী', 'মদনভস্ম' আর 'মোক্ষ'। একতালে নিবন্ধ 'পল্লবী' চোখ ও মনের তৃপ্তিদায়ক অনুষ্ঠান। 'মদনভস্ম' এককথায় এদিনের শ্রেষ্ঠ নিবেদন। নৃত্যের সংগে অভিনয়কে এখানে আশ্চর্য দক্ষতায় মিশিয়েছেন শিল্পী। তাঁর গ্রীবাভংগি, তাঁর চলার ছন্দ, তাঁর লয় এককথায় অনন্যসাধারণ। 'মোক্ষ'-এ সংযুক্তার আশ্চর্য নৃত্যভংগিমা সেই সংগে গতিময়তা আমাদের অনেকটা সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। গানে শিল্পীকে সহযোগিতা করেছেন রঘুনাথ পাণিগ্রাহী এবং পাখোয়াজে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র।

ওইদিনের সম্মেলনের শেষ শিল্পী দীপক চৌধুরী। তিনি প্রথমে বৈরাগী টোড়িতে আলাপ, জোড় ও ঝালা পরিবেশন করেন। শিল্পীর বাজানো রাগ ভৈরবী অসাধারণ। রূপকে আবদ্ধ এই ভৈরবী গৎটি বেশ কিছুদিন মনে রাখতেই হবে। ছন্দ এবং তেহাই-এরও তুলনা নেই। তবলায় স্বপন চৌধুরী আরো একবার ছন্দ ও গতির লাবণ্যে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ রাখলেন। তাঁর সওয়াল জবাব (তবলায়) সত্যিই অবিমিশ্র প্রশংসার দাবি রাখে।

জ্যোতির্ময় রায়

সংযুক্তা পাণিগ্রাহী



হেমন্তর আত্মচরিত

যথার্থ অর্থে 'অডিও-অটোবাইওগ্রাফি' বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছুর চল এদেশে নেই। বিদেশে আছে। সেদিক থেকে, শিল্পীসংসদ নিবেদিত এবং সি. বি. এস. রেকর্ড কোম্পানি কৃত 'সুরের আকাশে' রেকর্ডটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘতপা সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এতে শুধুই কয়েকটি সংগীত পরিবেশন করেননি, সেইসব সংগীতের বিভিন্ন অনুষংগ আলোচনা করতে গিয়ে নিজের জীবনপরিক্রমারও কিছু কথা শুনিয়েছেন। এটা শিল্পীর সম্পূর্ণ 'আত্মচরিত কথা' এমন দাবি অবশ্যই করা যাবে না, তবু তাঁর মুখে তাঁর নিজের কথা যেটুকু পাওয়া গেল তার মূল্য কম নয়। এমন একটি পরিকল্পনার জন্যে শিল্পীসংসদ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। আসলে, বেশ কিছু কাল আগে নায়ক উত্তমকুমারের উপস্থিতিতে গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান শিল্পীসংসদ নিবেদন করেছিলেন গোর্কি-সদনে। সেই অনুষ্ঠানটি সযত্নে ক্যাসেটে ধরে

রেখেছিলেন শিল্পী দীপংকর চট্টোপাধ্যায়। সি. বি. এস. সেই ক্যাসেটটি সংগ্রহ করেই আলোচ্য রেকর্ডটি আমাদের উপহার দেন। রেকর্ডটিতে খুব সংক্ষিপ্ত হলেও উত্তম-কুমারেরও কণ্ঠস্বর ধরা আছে। হেমন্তবাবু তাঁর নিজের সুরে গেয়েছেন 'সুরের আকাশে', 'আজ দুজনার দু'টি পথ', 'পৃথিবীর গান' 'চের কোই আয়সা', (ইন্সপেক্টর ছবির গান, যা আগে কোনো রেকর্ড সংরক্ষিত হয়নি), 'ঝড় উঠেছে' প্রভৃতি গানগুলি। এইসংগে সলিল চৌধুরীর সুরে তাঁর কণ্ঠে রয়েছে 'রানার', 'অবাক পৃথিবী', 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ' এই গান তিনটি। উত্তমকুমারের সুরে 'আমি যাই চলে যাই' (কাল তুমি আলেয়া ছবির) গানটিও রেকর্ডটিকে আদৃত করে তুলেছে।

দুঃখের বিষয়, রেকর্ডিং-এ কিছু ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেটা মূল ক্যাসেটেই ছিল কিনা, বলা মুশকিল। তবু, যেহেতু একটি অনুষ্ঠান থেকে এটি গৃহীত এবং পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিশেষত্ব রয়েছে, তাই এইসব ত্রুটি উপেক্ষা না করে উপায় নেই। □

বিশেষ প্রতিবেদক

সংগীতায়নের রজত জয়ন্তী উৎসব

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ধ্রুপদী ও লঘু সংগীতের নিষ্ঠাবান চর্চায় ব্রতী সংগীতায়ন। বেহালা অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট সংগীত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এলাহাবাদের প্রয়াগ সংগীত সমিতি, চণ্ডীগড়ের প্রাচীন কলাকেন্দ্র অনুমোদিত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'সংগীত প্রভাকর' এবং 'সংগীত বিশারদ' পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান ছাত্র-ছাত্রীরা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সংগীত-বিষয়ক পরীক্ষাও এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া যায়। সম্প্রতি বেহালার শরৎ সদনে সংগীতায়নের ছাত্র-ছাত্রীরা উপহার দিলেন একটি মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। শুরুতে সম্মিলিত বেদগান 'সংগচ্ছধং সংবদধ্বং'-এর প্রাণের স্পর্শ ছিল। শিশুশিল্পী পল্লব চক্রবর্তীর কণ্ঠে 'আমরা সবাই রাজা' আনন্দ দেয়। রীতা দত্ত রায়ের পরিবেশনে 'তোমারই ঝরনাতলার নির্জনে' সুখশ্রাব্য। এরপর ধ্রুপদ ও তারানার সংগে ভরতনাট্যম পরিবেশন করেন বিউটি দাস। তাঁর নাচের মুদ্রা ও ভঙ্গিমা মনোগ্রাহী। সংগীতে মানিকরঞ্জন দত্ত প্রবীণ বয়েসেও বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখেন। নজরুলগীতি 'খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর জলে' (শিল্পী : কুমকুম চক্রবর্তী ও সবিতা দাস) কিংবা অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে (শিল্পী সাগরিকা দত্ত। নৃত্যে : কুহেলিকা সরকার) প্রার্থিত বাঞ্জনাই এনে দেয়। এরপর ইমন কল্যাণ রাগে স্বাতী মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী ঘোষ দ্রুত খেয়াল গেয়ে শোনান। সন্ধেবেলার এই রাগের রূপটি সহজেই ফুটে ওঠে তাঁদের পরিবেশনে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা'। পরজে-বাঁধা 'ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে' গানটিতে সেই বিহ্বলতা মূর্ত হয়ে ওঠে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। মণিলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমবেত তবলা-লহরা হৃদয়গ্রাহী, তবে একটু দীর্ঘ মনে হয়েছিল। সাগরিকা দত্তের কণ্ঠে 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে' সহজেই মনের মধ্যে স্মৃতিচারণের ছবি ফুটিয়ে তোলে। মৌসুমী দাস বিশেষ দক্ষতার সংগে নিবেদন করেন একটি অসমীয়া গান। তাঁর উচ্চারণ ও পরিবেশনরীতি লোকসংগীত অনুসারী। সমবেত গানের সংগে সাঁওতালি লোকনৃত্য দৃষ্টিনন্দন। সংগের গানটিও শ্রুতিনন্দন। সেতারে রাগ রাগেশ্রী পরিবেশন করেন রীণা দত্ত। সংক্ষিপ্ত পরিবেশন, তবু মনোগ্রাহী। সোনারপুর কলেজের অধ্যক্ষ প্রণবকুমার দাশগুপ্ত (এদিনের বিশেষ অতিথিও) সাবলীল ভঙ্গিমায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্রসংগীত। সম্মিলিত গীটারে (সাত জন মহিলা শিল্পী, একজন পুরুষ) দেশাত্মবোধক গানের সুর হৃদয়কে উদ্দীপিত করে তোলে। তনুশ্রী রায়ের ভজনে নিবেদনের ভাবটি সুন্দর ফুটে ওঠে।

এদিনের অনুষ্ঠানে তবলায় মণিলাল মুখোপাধ্যায় ও জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সিনথেসাইজারে বিশ্বজিৎ চৌধুরী বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ড: লতিকা বসু (অধ্যক্ষা, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন)। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সোমেশ হোম চৌধুরী ও অঞ্জলি হোম চৌধুরী (প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষিকা, বেহালা জয়শ্রী শিক্ষানিকেতন)।

বিশেষ প্রতিনিধি



খেলার জগতে মেয়েরা কবে ছেলেদের সমান হবে ?

গত শতকে যেখানে মেয়েদের খেলাধূলার জন্য কপালে শান্তির বদলে শাস্তি জুটতো সেখানে ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করছেন আগামী শতকেই মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ১৮৯১ সালের ৮ আগস্ট আয়ারল্যাণ্ডের ইভা ফ্রান্সিসকো নামে এক ভদ্রমহিলা প্রথম ১০০ গজ দৌড় প্রতিযোগিতা ১৩ সেকেণ্ডে শেষ করার সময় কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন এই মেয়েরাই একদিন খেলার জগতে ছেলেদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। অথচ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে সমান অধিকার না পেয়েও প্রায় সমকক্ষের পথে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে রাস্তা-ঘাটে, অফিস-আদালতের বদলে খেলার মাঠে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে আসছে। কারণ তিরিশের দশকে ১০৮টা বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে মাত্র ১২টা বিশ্ব রেকর্ড ছিল মেয়েদের দখলে সেখানে পঞ্চাশের দশকে ১৯৭টা বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে মেয়েদের দখলে ছিল ৭৬টা। আর ষাটের দশকে যেখানে ২৫১টা বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে ৯৪টা মেয়েদের ছিল সেখানে সত্তরের দশকে ২১৪টা বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে ১১৮টা বিশ্ব রেকর্ডই মেয়েদের দখলে। অর্থাৎ ছেলেরা আপাতত মেয়েদের নীচে। আশির দশক শেষ হয়নি। অতএব আশির দশকের শেষে মেয়েদের রেকর্ড কোথায় যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ক্রীড়াবিশেষজ্ঞদের সমীক্ষা অনুযায়ী, শুধু বিশ্ব রেকর্ডের সংখ্যা ছাড়িয়েই মেয়েরা এখন ক্লান্ত নয়। সংগে বাড়ছে মেয়েদের ক্রীড়ামানও। কারণ ইতিমধ্যেই দেখা গেছে ১৯৩৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মেয়েদের ক্রীড়ামান বেড়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। ক্রীড়ামানের আর ২০ শতাংশ উন্নতি ঘটলেই এই শতকের শেষে কিংবা আগামী শতকের প্রথমার্ধেই মেয়েরা অন্তত খেলার আসরে ছেলেদের সমান সম্মান দাবি করতে পারে।

মেয়েরা ইতিমধ্যেই ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে

খেলার আসরে আগামী শতকের প্রথমার্ধে মেয়েরা ছেলেদের সমান হবার সম্ভাবনা ক্রীড়া বিজ্ঞানীরা কাগজে-কলমে দেখালেও ইতিমধ্যে কয়েকটা ইভেন্টে মেয়েরা ছেলেদের ওপরে উঠে গেছে। কারণ ১৯৭৩ সালে প্যাসিফিক অ্যাথলেটিক অ্যামেচারের উদ্যোগে ১০০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমেরিকার নাতালি কুলিমোর নামে একটি আঠারো বছরের মেয়ে আঠারো ঘণ্টার মধ্যে শেষ



ফিতে ছুঁয়ে বিজয়ী। মজার ব্যাপার হল এই প্রতিযোগিতাটি ছেলেমেয়ে উভয়দের জনাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু নাতালি কুলিমোরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে একজন পুরুষ অ্যাথলিট প্রায় দুঘণ্টা পরে এসে পৌছলেন। এহেন দূরপাল্লার দৌড়ে ছেলে এবং মেয়েদের পার্থক্যটা সহজেই অনুমেয়। প্রসংগত জানিয়ে রাখা ভাল – ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে শারীরিক দিক দিয়ে মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় দুর্বল মনে হলেও শরীরের ভেতরে হাড়ের গঠন বা কাঠামোগত সুবিধার জন্য মেয়েদের মন ছেলেদের থেকে বেশি শক্তিশালী। কারণ সম্প্রতি একটি মেডিকেল টেস্টে দেখা গেছে – একজন মহিলা যেখানে একেবারে না ঘুমিয়ে এক নাগাড়ে প্রায় ৭০ ঘণ্টা জাগতে পারে সেখানে একজন ছেলে একনাগাড়ে জাগতে পারে বড়জোর ৩০ ঘণ্টা। তাই দূরপাল্লার ইভেন্টে মেয়েদের জুড়ি নেই। কারণ ১৯৭১ সালে ৫০ মাইল উন্মুক্ত দৌড় প্রতিযোগিতাতেও নাতালি কুলিমোর ৭ ঘণ্টা ৩১ মিনিটের মধ্যে অনেক পুরুষ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলেই বিশ্ব রেকর্ডও করেছিলেন। এমনকি ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ৫০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতার রেকর্ডটি ৬ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে নামিয়ে এনেছিলেন এলিন ওয়ার্টাস নামে আরেকজন আমেরিকান মেয়ে। এবং এতবড় একটি দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ মাইলটি মাত্র সাড়ে ছয় মিনিটের মধ্যে শেষ করেছিলেন ওয়ার্টাস। শেষ মাইলে এত দ্রুততা তখনো পর্যন্ত কোন পুরুষের পক্ষে দেখানো সম্ভব হয়নি। যদিও এই মুহূর্তে ৫০ মাইলের রেকর্ডটি ছেলেদের হাতেই। ৫০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতার মত ৫০ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার রেকর্ডটিও একদা গ্রেটা অ্যান্ডারসন নামে এক ভদ্রমহিলার ঘরে ছিল। দূরপাল্লার সাঁতার বলতে গেলে প্রথমেই অবশ্য ইংলিশ চ্যানেলের কথা মনে পড়ে যায় এবং প্রায় ৮০ কিলোমিটারের ইংলিশ চ্যানেল অনেকেই পার হয়েছেন। কিন্তু ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেখা যায় অন্তত তিনজন ভদ্রমহিলার রেকর্ড ছেলেদের তুলনায় অনেক উন্নত। ১৯৭৭ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত ইংলিস চ্যানেল পার হবার জন্য কুড়ি বছরের মেয়ে ওয়েন্ডি ব্রুকস মাত্র ৮ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট সময় নেবার পর বহু ছেলের ঘুম ভেঙে যায়। প্রসংগত জানিয়ে রাখা ভাল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত একজন পুরুষ সাঁতারুর পক্ষে ১০ ঘণ্টা ২১ মিনিটের আগে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে ১৯৭৭ সালেই ইজিপ্টের একজন মেয়ে নাজেরেল শাজলি আবার ব্রুকসের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে সময় নেন ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। ১৯৭৮ সালে আমেরিকার ছাত্রী পেনি ডিন ৭ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল একসাথে পার হয়ে মেয়েদের সম্মান তুংগে তুলেছিলেন। এদিকে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার হবার জন্য দুদিকেই না থেমে ১৯৭৯ সালে কানাডার ১৯ বছরের মেয়ে সিন্ডি নিকোলাস ১৯ ঘণ্টা ১২ মিনিটের যে রেকর্ড করেছেন তা এখনো কোন পুরুষের পক্ষে ভাঙা সম্ভব হয়নি।

দূরপাল্লার সাঁতারের মত ১২ ঘণ্টার টাইম-ট্রায়াল সাইক্লিং ইভেন্টেও গ্রেট ব্রিটেনের বেরিল বার্টন নামে একজন মহিলা সাইক্লিস্ট ১৯৬৭-৬৮ সালে ২৭৭.২৫ মাইল চালিয়ে ছেলেদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ তখন পুরুষদের ১২ ঘণ্টার টাইম ট্রায়াল রেকর্ড ছিল ২৭৬.৬৫ মাইল। এছাড়া আর্চারি বা তীরন্দাজীতেও মেয়েরা এখন ওপরে। আর ২৫ হাজার মিটারের বেশি দূরত্বের যাবতীয় রোলার স্কেটিং রেকর্ড এখনও প্রমীলাবাহিনীর হাতে।

সাইক্লিস্ট হিসাবে বেরিল বার্টন মেয়েদের গর্ব।



মেয়েদের সুবিধা-অসুবিধা

খেলার জগতে ছেলেদের সমকক্ষ হবার পক্ষে মেয়েদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল শরীর। কারণ খেলাধূলার জন্য উপযুক্ত যেরকম শারীরিক কাঠামো বা গঠন দরকার তার সবদিক থেকেই ছেলেরা এগিয়ে। যেমন মেয়েদের হৃদপিন্ড ছেলেদের হৃদপিন্ডের তুলনায় ১৫ শতাংশ ছোট তেমনি ছেলেরা ওজনের ক্ষেত্রেও মেয়েদের থেকে এগিয়ে। গড়ে মেয়েদের ওজন ছেলেদের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ কেজি কম। এদিকে ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন ১০ শতাংশ ওজন বেশি হলে অন্তত ২০ শতাংশ দৈহিক শক্তি বেশি হয় এবং দৈহিক শক্তির দৌলতে ছেলেদের মাসলেস অ্যাকাউন্ট যেখানে ৪০ শতাংশ সেখানে মেয়েদের মাসলেস অ্যাকাউন্ট মাত্র ১৮ শতাংশ অর্থাৎ ২২ শতাংশ কম। আবার উচ্চতার ক্ষেত্রেও মেয়েদের একই সমস্যা। ছেলেদের গড় উচ্চতা যেখানে ১.৮৫ মিটার সেখানে মেয়েদের গড় উচ্চতা ১.৭০ মিটার। অথচ উচ্চতা যত বেশি হয়, অক্সিজেন আদান-প্রদানের তত সুবিধা হয় এবং হিসাব করে দেখা গেছে ছেলেরা যেখানে গড়ে ১০ লিটার অক্সিজেন নিতে পারে সেখানে মেয়েরা বড়জোর ৭ লিটার। একমাত্র জাপানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেছে ছেলেদের গড় উচ্চতা যেখানে ৪ থেকে ৭ সেন্টিমিটার বেড়েছে সেখানে মেয়েদের গড় উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ১১ সেন্টিমিটার এবং এই উচ্চতা বাড়ার কারণ নাকি ক্যালসিয়াম ও দুধ গ্রহণের ফলে। জাপানের মত মেয়েদের যত উচ্চতা বাড়ে ততই খেলাধূলার জগতে মেয়েদের লাভ। এদিকে ইউরোপে দেখা গেছে দেহের উচ্চতার তুলনায় ছেলেদের পায়ের লেংথ যেখানে ৫২ শতাংশ সেখানে মেয়েদের ৫১ শতাংশ। এবং পায়ের লেংথ বড় হওয়ার সুবিধা ছেলেরা সর্বত্রই দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমেরিকাতে থাডাস কোসট্রুবালা 'জয় অব রানিং' বইতে একটি সমীক্ষা করে দেখেছেন ৪২ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে যে মেয়েদের স্ট্রাইড বা পদক্ষেপ দেহের উচ্চতার তুলনায় লম্বা এবং প্রতি মিনিটে ছেলেদের থেকে বেশি পদক্ষেপ মেয়েরা ফেলতে পারে। এই কারণেই

হয়তো দূরপাল্লার দৌড়ে মেয়েদের সুবিধা। উল্টোদিকে মেয়েদের গড় উচ্চতা কম থাকার ফলে জাম্পিং ইভেন্টে অসুবিধা। মেয়েদের স্তনযুগলের জন্য ছেলেদের তুলনায় দেহের মেদ প্রায় দ্বিগুণ। কারণ গড়ে ছেলেদের মেদ যেখানে ৭ শতাংশ সেখানে মেয়েদের প্রায় ১৫ শতাংশ। ফলে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টে মেয়েদের প্রচন্ড অসুবিধা হলেও সাঁতারের মত জলক্রীড়ায় এই



স্তনযুগলই মেয়েদের একটু বাড়তি সুবিধা দেয়। কারণ এই স্তনযুগলের মধ্যে দিয়ে জল যাওয়ার জন্য মেয়েদের হরাইজেন্টালি জলে পা ছুঁড়তে সুবিধা হয়। এছাড়াও মেয়েদের উরুতে ছেলেদের তুলনায় বেশি মাংস থাকার ফলে সাঁতারের মত জলক্রীড়ায় ছেলেদের তুলনায় অন্তত ২০ শতাংশ শক্তি কম ক্ষয় হয়। তাই হয়তো দূরপাল্লার সাঁতারেও মেয়েরা এখন এগিয়ে। ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন মেয়েদের দেহের ভেতর হাড়ের কাঠামোগত সুবিধার জনাই জিমন্যাস্টিক্সের মত অ্যাক্রোবেটিক্স খেলাধূলায় মেয়েরা অনেক বেশি এগিয়ে। এমনকি সম্প্রতি চীনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা করে দেখা গেছে মেয়েদের রি-অ্যাকশন ছেলেদের তুলনায় ০.৪ শতাংশ বেশি। এটাও জিমন্যাসটিক্সের মত খেলাধূলায় একটা বাড়তি সুবিধা। সম্প্রতি ফ্লোরিডাতে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের দৃষ্টিশক্তিতে ভারটিক্যাল রেঞ্জ ছেলেদের তুলনায় অন্তত ৫ শতাংশ বেশি এবং সেইজন্য হয়তো শুটিং বা তীরন্দাজীর মত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন খেলায় মেয়েরা এগিয়ে।

মেয়েদের প্রধান শত্রু মিডিয়া

এখন পৃথিবীর যেকোন উন্নতির ব্যাপারে সবার আগে প্রয়োজন পাবলিসিটি বা প্রচারমাধ্যম। অথচ মেয়েদের খেলাধূলার উন্নতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা সত্যি লজ্জাকর। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই সংবাদপত্র, দূরদর্শন বা রেডিওর মত সমস্ত প্রচারমাধ্যমগুলিতে ছেলেদের খেলার খবরের ছড়াছড়ি।

২৫০০০ মিটারের ওপরে যাবতীয় রোলার স্কেটিং রেকর্ড এখন মেয়েদের দখলে।





মুখে সাংবাদিকরা সমান সম্মানের কথা বললেও কাজের বেলায় দেখা যায় ছেলেরাই সব। মেয়েরা যেন কেউ নয় এবং সেই অর্থে মিডিয়াই এখন মেয়েদের প্রধান শত্রু। কারণ সম্প্রতি একটি মিডিয়া সমীক্ষায় দেখা গেছে – আমেরিকার ন্যাশানাল ব্রডকাস্টিং সেন্টারে ১৯৭২ অগাস্ট থেকে ১৯৭৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বসমেত ৩৬৬ ঘন্টা স্পোর্টস প্রোগ্রাম হয়েছে। তারমধ্যে মেয়েদের জন্য স্পোর্টস প্রোগ্রাম কতটা? শুনলে আঁতকে উঠতে হয়! মাত্র একঘন্টা। মেয়েদের উম্বলডন ফাইনালের জন্য। বৈষম্যের চরম পরিণতি। ১৯৮০ সালে অস্ট্রেলিয়া ব্রডকাস্টিং সেন্টারে সর্বসমেত ২০০ ঘন্টা ৩৯ মিনিট স্পোর্টস প্রোগ্রামের মধ্যে ওলিম্পিক্সে অমর মহিলাদের একটা অনুষ্ঠানের জন্য দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৫ মিনিট। ভাবা যায় না। অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিশান স্পোর্টস প্রোগ্রামের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে – মেয়েদের খেলার খবরের তিনগুণ বেশি ছেলেদের খেলার খবর দেখানো হয় এবং চারগুণ বেশি খেলাধূলার ফলাফল জানানো হয়। খেলাধূলার ছবি দেখানোর ব্যাপারেও তথৈবচ।

খেলাধূলার 'অ্যাকশান' ছবি ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ দেখানো হয় ছেলেদের অর্থাৎ মেয়েদের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১০ শতাংশ। আর 'নন-অ্যাকশান' ছবি ৭০ থেকে ৯৩ শতাংশ দেখানো হয় ছেলেদের অর্থাৎ মেয়েদের জন্য মাত্র ৭ শতাংশ! আমেরিকার প্রচন্ড জনপ্রিয় ক্রীড়াপত্রিকা 'স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড' ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১.৪ শতাংশ পাতা মেয়েদের খেলার খবর আর মাত্র ৮.২ শতাংশ ছবি ছাপিয়েছে। এহেন স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড ৭৬ সালে একটি সংখ্যায় জানিয়েছিল – খেলাধূলা করলে নাকি মেয়েদের নানারকম জৈবিক ব্যবহারে পুরুষত্ব বেড়ে যায় বলে খেলাধূলা না করাই ভাল। সত্তর দশকেও তথাকথিত সাংবাদিকদের এই ধারণাই প্রমাণ করে দেয় মেয়েদের খেলাধূলার প্রধান শত্রু এখন মিডিয়া।

দূরপাল্লায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি দক্ষ।



ছেলেদের সমান হবার সম্ভাবনা

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিজ্ঞানী ডঃ ব্রায়ান লয়েড ১৯৮০ সালে 'ব্রিটিস অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স' সেমিনারে জানিয়েছেন – দৈহিক এবং মানসিক নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও মেয়েরা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ২০০০ সালেই প্রায় ছেলেদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। ব্রায়ান লয়েডের, এনার্জি – ব্যালান্স ইকুয়েশান, তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই আরেক ক্রীড়াবিজ্ঞানী কে এফ ডায়ার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ছাড়াও অন্যান্য ইভেন্টে কোন সালে কতটা সমকক্ষ হবার সম্ভাবনা আছে তা হিসাব করে জানিয়েছেন একটি পরীক্ষিত তালিকায়। হিসাব অনুযায়ী ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে স্প্রিন্ট ইভেন্টে ১৯২৭ সালে যেখানে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায়২১.৩৫ শতাংশ পিছিয়ে ছিল। সেখানে ১৯৮০ সালে পার্থক্য মাত্র ৮.৫২ শতাংশ। মেয়েদের উন্নতি সহজেই অনুমেয় এবং উন্নতির হার অনুযায়ী ২০৪০ সালেই হয়তো স্প্রিন্ট ইভেন্টে সমকক্ষ হবার সম্ভাবনা আছে। মাঝারি পাল্লার দৌড়ে এখন পার্থক্য মাত্র ১০.৮৩ শতাংশ। আর দূরপাল্লার দৌড়ে পার্থক্য মাত্র ১৩.৩০ শতাংশ। মাঝারি পাল্লার দৌড়ে ২০২৫ সাল এবং দূরপাল্লার দৌড়ে ২০০০ সালেই সমকক্ষ হবার সম্ভাবনা। সাঁতারে ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে ১৯৩৬ সালে পার্থক্য ছিল যেখানে ১২ শতাংশ ১৯৭৬ সালে সেখানে পার্থক্য মাত্র ৮.৭৪ শতাংশ। হিসাব অনুযায়ী ১৯২৮ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বরেকর্ডের ভিত্তিতে সাঁতারে ১০০ মিটারে ৭.৩৩ শতাংশ, ২০০ মিটার ৯.৯৮ শতাংশ, ৪০০ মিটারে ৬.৪০ শতাংশ এবং ৮০০ মিটারে ৮.৫৯ শতাংশ, ১৫০০ মিটারে ৫.৪৬ শতাংশ ছেলেদের থেকে বেশি মেয়েদের উন্নতি হয়েছে। তেমনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার, ১৫০০ মিটার দৌড়েও মেয়েদের উন্নতি আশাতীত। যেমন ১৫০০ মিটারেই শুধু ১৫.৪৭ শতাংশের বেশি মেয়েদের উন্নতি। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এহেন উন্নতিই আগামী শতকে সমকক্ষ হবার দাবির পক্ষে যথেষ্ট। □

প্রদীপ দে

নিজেকে জানুন

(মনঃপ্রশ্নচর্চা)

সাফল্য অর্জনে আপনার অধিকার – সামর্থ্য কতটুকু ?

ডঃ অসীম বর্ধন

আমরা সকলেই তো বলি, সাফল্য অর্জন করব, সফল হতে চাই – কিন্তু তার অধিকার – সামর্থ্য আমাদের কতটুকু আছে। তা কি ভাল করে ভেবে দেখি ?

বোধহয় ওকথা ভাবি না বলেই যখনই বেকায়দায় পড়ি, নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষ দিই, নয় তো সুযোগ-সুবিধার অভাবের অজুহাত খুঁজি – আসলে হয়তো দোষটা লুকিয়ে থাকে আমাদের নিজেদের মনোভঙ্গির মধ্যে, আমাদের কাজের ধারা কিংবা লোকজনের সংগে মেলামেশার ধরন-ধারণের কোনো ত্রুটির মাঝে।

এ বিষয়ে যদি আপনি নিজেকে যাচাই করে দেখতে চান, তাহলে নিচের মনঃপ্রশ্নচর্চা অনুযায়ী প্রশ্নগুলির জবাব দিতে চেষ্টা করুন। কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে যান প্রত্যেকটি প্রশ্নের।

১। আপনি বেশ ঠান্ডা মেজাজে কড়া সমালোচনা, নিন্দে শুনতে পারেন একটুও ক্ষেপে না গিয়ে ?

২। আপনি কি এমন বুদ্ধিমান যে, কখন মুখটি বুজে থাকতে হবে, কখন কোথায় ঠিক কোন কথাটি বলতে হবে, তা বোঝেন ?

৩। ঝোঁকের মাথায় যে-কাজ করে বসলে বোকামির পরিচয় দেবে, সে কাজে বিরত হওয়ার মতো আত্মনিয়ন্ত্রণ আপনার আছে বলে মনে করেন কি ?

৪। আপনি কি সহজে স্বচ্ছন্দে যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মিশিয়ে নিতে পারেন ?

৫। আপনি কি সব সময়ে মানুষের কোনো কাজে লাগবার জন্যে এবং ঝঞ্ঝাট পোয়াবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকেন ?

৬। সময় ধরে কাজকর্ম করার ব্যাপারে আপনি কি খুব সচেতন, বেশ সময়ানুবর্তী ?

৭। আপনাকে কি এতখানি বিশ্বাসনির্ভর করে কোনো কাজের ভার দেওয়া চলে –যে কাজের কোনো তদারকি না করলেও আপনি ঠিকমতো করে রাখবেন ?

৮। আপনার কাজকর্ম যাই করুন, তাতে কি আপনি সত্যি সত্যি বেশ গর্ব অনুভব করেন ?

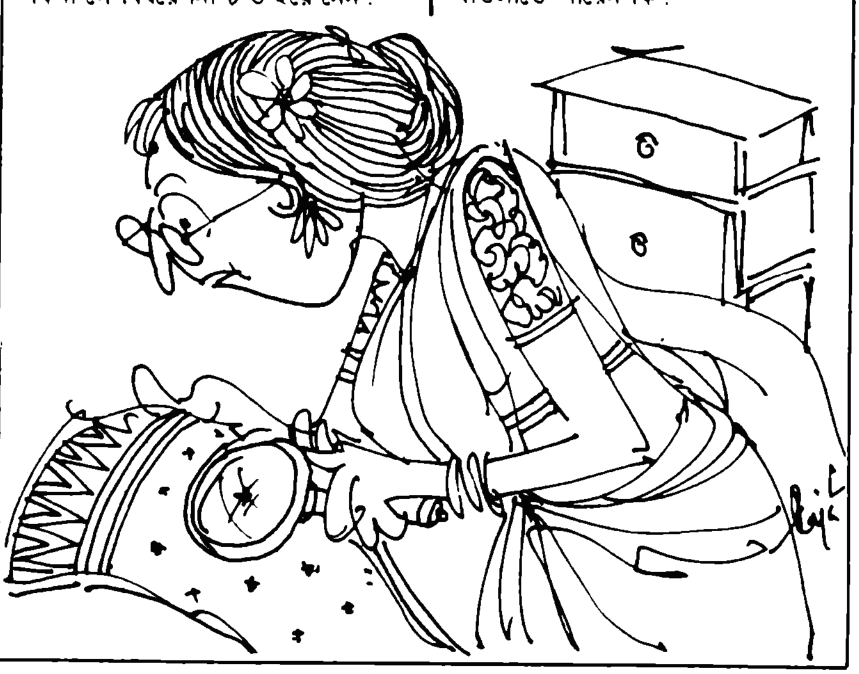
৯। সব জিনিস আপনি কি খুঁটিয়ে বিচার করে নেন এবং ঠিক আপনার যা দরকার, তা পেয়েছেন বা জেনেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নেন ?

১০। কোনো বিষয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আপনি কি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন এবং অন্য সকলে সব ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় নিলেও আপনি ধীর-স্থির হয়ে বোঝাতে পারেন ?

১১। কোনো নতুন অবস্থা-পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আপনি কি খুব তাড়াতাড়ি সেটি বুঝতে পারেন এবং সেই মতো নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন ?

১২। যে কাজ বেশ শক্ত, একঘেয়ে কিংবা অস্বস্তিকর, সে কাজ স্থগিত রেখে দেবার মনোভাব জাগলে তা দমন করতে আপনি পারেন কি ?

১৩। কোনো বিষয়ে সব ভাল-মন্দ দিক আপনি যুক্তি দিয়ে সুন্দরভাবে যাচাই করে কাজের মতো একটা সিদ্ধান্ত বাতলাতে পারেন কি ?



১৪। কোনো নতুন সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য আপনি কি সদাজাগ্রত মন নিয়ে সব দিকে লক্ষ্য রাখেন। এবং ঠিক তেমনি সজীব মন নিয়েই সেই সব সুযোগকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাবার জন্যে লেগে থাকেন ?

১৫। দায়িত্ব কাঁধে নেবার জন্যে আপনি কি আগ্রহবোধ করেন এবং প্রস্তুত হয়ে আছেন ?

১৬। বলতে পারেন, আপনার নিজের ওপর এবং নিজের সামর্থ্যের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন কি ?

১৭। লোকজনের সংগে আপনি কি বেশ স্বচ্ছন্দে এবং মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কথা বলতে পারেন ?

১৮। লোকের অপছন্দ, ঈর্ষা, প্রত্যাখ্যান – এসব যখন আপনি শোনেন, তখন বেশ বিচলিত বা মনমরা না হয়ে পড়ে, সহ্য করে থাকতে পারেন কি ?

১৯। আপনার সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার একটি লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেন কি ?

২০। যখন নানা বাধা-বিঘ্ন আপনার কাজের সামনে এসে পড়তে থাকে, তখন কি আপনি উদ্যম ও সাহস বজায় রেখে চলতে পারেন ?

আশাকরি, পূর্ণ আন্তরিকতার সংগে সব কটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন।কটি 'হ্যাঁ' জবাব দিয়েছেন, লিখে রাখুন। আগামী সংখ্যাতেই পেয়ে যাবেন আপনার জবাবগুলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাসূত্র। আর সেই সংগে পাবেন আপনার সাফল্য অর্জনের অধিকার – সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার মূল্যবান মনোবৈজ্ঞানিক পথনির্দেশ।

আপনার আচরণ-ভব্যতা কেমন ?

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত মনঃপ্রশ্নচর্চার ব্যাখ্যাসূত্র)

আন্তরিকভাবে প্রথম দশটি প্রশ্নের প্রত্যেকটিতে 'হ্যাঁ' জবাব দিয়ে থাকলে আপনি ৫ পয়েন্ট করে পাবেন এবং ১১ নং থেকে ২০ নং প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিতে 'না' জবাব দিলে পাবেন ৫ পয়েন্ট করে।

মোট ৭০ পয়েন্ট বা তার বেশি পেলে বোঝা যাবে আপনি অন্যের সংগে মাধুর্যময় এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাপকাঠিতে সন্তোষজনক বিকাশলাভ করেছেন।

'৫০ থেকে ৬৫ পয়েন্ট পেলে মনে করতে হবে আপনার বিনয়-নম্রতা মোটামুটি আছে, তবে মাঝে মাঝে অবিবেচক হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

যদি ৪৫ পয়েন্ট বা তারও কম পেয়ে থাকেন কেউ, তাহলে সত্যি সত্যি পাঁচজনের সংগে তাঁর মনোভঙ্গির আমূল সংস্কার করার চর্চা এখনই তাঁকে শুরু করতে হবে।



ভব্যতাকে সহানুভূতির অভিপ্রকাশ বলা যেতে পারে। অন্যজনে কিসে সুখ তৃপ্তি পায়, আর কিসে অস্বস্তি বোধ করে, তার প্রতি সহানুভূতি যার জাগে, তারই আচরণে ফুটে ওঠে ভব্যতা। এই সহানুভূতি এবং সমবেদনা যার মনে যতো সূক্ষ্ম হবে, তার ভব্যতাপূর্ণ আচরণ ততোই মধুর মনোরম হবে। আপনি যদি আপনার আচরণগুলি আরও ভবিযুক্ত করতে চান, তাহলে মানুষের মনের তৃপ্তি এবং অস্বস্তির কথা আরও বেশি করে বোঝবার চেষ্টা করুন। খুবই সামান্য একটি সৌজন্যপূর্ণ কথা বা একটুকু মিষ্টি আচরণ মানুষকে হৃদয়ভরা তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। আপনি চারিদিকে নজর রাখলেই এরকম আচরণ কৌশলের নমুনা আজস্র পেয়ে যাবেন, শিখে নিতে পারবেন।

সুকন্যা

সহকারী সম্পাদক : রানা দাস
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

চিফ এগজিকিউটিভ,
বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ :
সি এইচ বসু, কলকাতা
সার্কুলেশন কন্ট্রোলার : প্রসাদচন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজি: অফিস :
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড,
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১,
২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১
Telex 021-5092 IPPL-IN

দিল্লি অফিস :
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০০০১,
ফোন : ৩৩১ ৭০২৪
জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি

বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশাল বিজনেস সেন্টার, ওয়ার্ডেন হাউস (দ্বিতল)
স্যার পি এম রোড, ফোর্ট, বোম্বাই ৪০০ ০০১
ফোন : ২৮ ৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৫৮
Grams VIBICENT
Telex 011-5726 AMSL-IN
ব্যাঙ্গালোর প্রতিনিধি : সি আর ভরত
১৫৯, এন জি ই এফ কলোনি
রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০২৪
হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধি : এস শঙ্করনারায়ণ
ফ্ল্যাট সি ২ নবোদয় কৃপা, ১-১-৫০৮/সি ২, বাকারাম
হায়দ্রাবাদ ৫০০ ৩৮০, ফোন : ৬৬ ৭০০
মাদ্রাজ প্রতিনিধি : পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট, পুরসাওয়াক্কম, ডাওয়ার্স রোড পোস্ট
মাদ্রাজ – ৮৪, ফোন : ৬৬-৪৭২১

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪ ০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।



"আমার ডাক্তার যখন বললেন
কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার
সত্যিই চুল পড়া বন্ধ করে,
আমি শুনে অভিভূত হয়েছিলাম।

কিন্তু ব্যবহারের পর আমি তা
পুরোপুরি বিশ্বাস করি।"

"ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার* অনেক গবেষণার পর অভিনব বৈজ্ঞানিক ফরমুলায় তৈরী। তিনি আরো বলেছিলেন ; চুলের গোড়া শক্ত করার জন্য এতে আছে প্রয়োজনীয় সবরকম প্রোটিন, কো-এনজাইম এবং ভিটামিন।
আমিও দেখছি, ঠিক তাই, এর ব্যবহারে আমার চুলপড়া বন্ধ হয়েছে, খুস্কিও চলে গেছে।"

এবারে এই রিসার্চ রিপোর্টটি পড়ে দেখুন

"৬৬·৬৬% ক্ষেত্রে চমৎকার এবং ৩৩·৩৩% ক্ষেত্রে বেশ ভালো ফল পাওয়া গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খুস্কিপড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চুলপড়া প্রায় রোধ হয়েছে···অতএব বলা যেতে পারে কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার এক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেছে।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট ১১৮ ২২৩ (১৯৮৪)



পরীক্ষিত ও প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুল পড়া বন্ধ করে।

Dey's দে'জ মেডিক্যাল। যাদের যত্নই আপনার আস্থা।

*এটি কোন প্রসাধন সামগ্রী নয়।

SUKANYA 16 APRIL 1988 Regn. No. 42166/84/RNI Postal Regn. No. WB/CC - 423 Rs. 5.00

রূপচর্চা লাগি শিঙ্গার ডালি





"আহা কি সুন্দর সিন্দুর পরা কবরী, বাঁকা ভুরু মাঝে রাঙা টিপখানি,
আঁখি হিল্লোলে মরি-মরি।"

যুগ-যুগ ধরে নারীর রূপের ডালির জয়গান। আর রূপের ডালি সাজাতে রূপচর্চার জন্য শিঙ্গার ডালি অনন্য। যেমন, শিঙ্গার সিন্দুর... সৌভাগ্যবতীর এয়োতির চিহ্ন, যে অক্ষয় সিন্দুর ঝরে পড়ে না; শিঙ্গার কুমকুম টিপ...কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মত জ্বলজ্বল করে, কখনো চিড় খায় না; শিঙ্গার কাজল...দেখায় কাজল নয়না হরিণীর মতন। আর এসবই এমন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পদ্ধতিতে বানানো, যার ফলে এর দরুন কোনও চর্মরোগ বা আঁখির রোগ হয় না।

শিঙ্গার সিন্দুর, কাজলে ও কুমকুম

ভারতীয় নারীর রূপচর্চার সুন্দরতম ডালি!